প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

প্রশিক্ষণ মডিউল

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ডিসেম্বর - ২০১৭

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৭

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

প্রশিক্ষণ মডিউল

সংকলন

ড. আ. হ. ম. সাইফুল ইসলাম খান
ড. মোহাম্মদ বজলুর রহমান
ড. হোসেন মোঃ সেলিম
ডাঃ নাছরিন পারভীন
ডাঃ মনিরুজ্জামান তরফদার

সমন্বয়

ট্রেনিং এন্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার (টিটিটি)
বাড়ি-৫৯, রোড-১২এ, ধানমন্ডি, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক

উপদেষ্টা

ডাঃ মোঃ আইনুল হক
মহাপরিচালক

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৭

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের অবদান অতিব গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তাদের জীবিকায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ উপখাতের ওপর নির্ভরশীল। এই উপখাত মানব খাদ্য হিসেবে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে এখাতে জড়িত বেকার যুবক-যুবতিসহ কর্মহীন মানুষের জন্য তৈরি করছে টেকসই জীবিকায়ন বিশেষ করে পারিবারিক আয় ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করছে। বর্তমানে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান শতকরা ১.৬৬ ভাগ হলেও দিন দিন এ অবদান বেড়েই চলছে।

গুনগতমান সম্পন্ন প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানসম্মত উপকরণের যোগান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে খামার পর্যায়ে ব্যবহৃত উপকরণ যেমন খাদ্য, সহযোগী খাদ্য উপকরণ, ঔষধ, টিকা ইত্যাদির গুণগতমান সন্দেহাতীত নয়। তাই সরকার খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করণে মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। সত্যিকার অর্থে উক্ত বিধিমালা বাস্তবায়নে আমাদের আন্তর্জাতিক মানের একটি গবেষণাগার স্থাপনআশু প্রয়োজন। বর্তমান সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতিমধ্যে 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপিত হলে খামারে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। খামারে ব্যবহৃত উপকরণের উন্নত মান নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে অন্যদিকে তেমনি প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি সম্ভব হবে। তাছাড়া স্থাপিতব্য এই গবেষণাগার বাংলাদেশ ও বহিঃবির্শ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এবং একটি রেফারেন্স গবেষণাগার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ফলে দেশে উৎপাদিত প্রাণিজ খাদ্য বিদেশে রপ্তানির দুয়ার উন্মোচিত হবে যা এখাতে নতুন নতুন উদ্যোগক্তাকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করবে।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল সমৃদ্ধ এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এম.পি.
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির এক অতিব গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। দেশের জনসংখ্যা ও অবকাঠামোর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জন্য জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই সীমিত জায়গায় বর্ধিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। ফলে দেশের বিশাল জনগোষ্টির জন্য একদিকে যেমন প্রাণিজ আমিষ যথা দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ও সচেনতা বৃদ্ধির ফলে মান সম্মত প্রাণিজ উৎপাদনের বিষয়টি ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পাচ্ছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রাণিসম্পদ দেশের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন আজ প্রশ্নাতীত নয়।

মানসম্মত প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্মন্ন খাদ্য উপকরণের যোগান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশে এসকল উপকরণের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। ফলশ্রুতিতে এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। খাদ্য উপকরণের মান গুণগত না হলে প্রাণিজাত উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন রোগের প্রতি পশুপাখির সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও নতুন রোগের প্রকোপ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সরকার বিষয়টি আশু সমাধানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। সরকার আশা করছে উক্ত মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার চালু হলে দেশের জনগণের জন্য একদিকে যেমন নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা যাবে অন্যদিকে তেমনি বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে প্রাণিসম্পদ খাতে নিত্য নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, যা সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের পথ সুগম করে তুলবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক মানের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার পরিচালনার জন্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল প্রয়োজন। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সর্বশেষ জীব কলাকৌশল সর্ম্পকিত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি। মডিউলটির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাবে ভোক্তাদের চাহিদা মাফিক নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানসহ প্রাণিজাত উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতাই হতে পারে মেধা ও মননে সুস্থ জাতি গঠনের সোপান।

‘প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প’ -এর উদ্যেগে এই মডিউলটি প্রণয়নে ও সংকলনে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আমাদের কৃষিভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান হারে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়নের ফলে চাষযোগ্য জমি কমে যাওয়ায়, স্বল্প জায়গায় বাণিজ্যিকভাবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন-পালন করা হচ্ছে- এর ফলে ফলে পশুপাখির ঔষধ, খাদ্য উপকরণ ও সহযোগী খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। এসকল উপকরণের দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। ফলে বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত এ সকল পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারসহ মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বেশ কিছু গবেষণাগার থাকলেও পশুপাখির খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ বা উৎপাদিত প্রাণিজাত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণে এসকল গবেষণাগারের সুযোগ খুবই সীমিত। তাছাড়া উৎপাদিত প্রাণিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক মানের রেফারেন্স গবেষণাগার হতে প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন হয়। মানসম্মত প্রাণিজাত দ্রব্য নিশ্চিতকরণ ও বর্ধিত উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' স্থাপন করা হচ্ছে। গবেষণাগারটি স্থাপিত হলে প্রাণিসম্পদের সকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত রোগ জীবাণু, রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে। প্রাণিসম্পদ খাতের উপকরণ আমদানি, রপ্তানি, বিপনন, বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এই গবেষণাগারের প্রত্যয়নপত্রকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে উপকরণের গুণগত ও পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল সম্পর্কিত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ একটি মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, ল্যাব টেকনিশিয়ান, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

মডিউলটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

কৃষিভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান দিন দিন বেড়েই চলছে। প্রাণিসম্পদ আমাদের পুষ্টি নিরাপত্তা এবং মেধা বিকাশে প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের যোগান নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়াও কৃষিকাজ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৮০% মানুষ তাদের জীবিকায়নের জন্য প্রাণিসম্পদের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বিগত কয়েক দশকে দেশে পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং এ শিল্পের সহযোগী হিসেবে অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, যত্রতত্রভাবে আমদানিকৃত প্রাণিজাত উপকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন রোগ জীবাণু, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এমনকি আভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগের জীবাণু এক খামার থেকে অন্য খামারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাম্প্রতিককালে গরুর মাংস ও বোনমিল -এর মাধ্যমে 'ম্যাডকাউ' নামক রোগ বিস্তারের সাথে পৃথিবী পরিচিতি পেয়েছে। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে আধুনিক মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করতঃ খামারে ব্যবহৃত উপকরণ এবং খামার হতে উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্যের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে ৬৪টি জেলা প্রাণি হাসপাতাল, ৯টি এফডিআইএল, ১টি সিডিআইএল, ১টি নিউট্রিশন ল্যাব, ১টি পাবলিক হেলথ সেকশন এবং ১টি ভ্যাকসিন মান নিয়ন্ত্রণ শাখা চলমান আছে যেখানে পশুপাখির রোগ নির্ণয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই গুনগতমান সম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ ও উৎপাদনের মহান এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' স্থাপন করা হচ্ছে। এই গবেষণাগার মানসম্পন্ন উপকরণ নিশ্চিত করতঃ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সর্বশেষ জীব কলাকৌশল সম্পর্কিত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, এআই টেকনিশিয়ান ও সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি। মডিউলটির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাবে মানসম্মত দুধ ও মাংস উৎপাদন, সর্বস্তরের জনসাধারণের উন্নত মানের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, বুদ্ধিভিত্তিক ও মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

পর্যাপ্ত ব্যবহারিক কলাকৌশল ও তথ্য সন্নিবেশিত প্রশিক্ষণ মডিউলটি মুদ্রণের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

ডাঃ মোঃ আইনুল হক
মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের
মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। জিডিপিতে এখাতের অবদান শতকরা ১.৬৬ ভাগ। কর্মসংস্থান, পশুশক্তি, জ্বালানী, জৈবসার উৎপাদন, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হলে এখাতের সামগ্রিক অবদান শতকরা ১৫ ভাগের অধিক। মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২০ ভাগ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী এবং বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার অবলম্বন হিসেবে প্রাণিসম্পদের অবদান অপরিসীম। দেশের জনসংখ্যা ও অবকাঠামোর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি কমে যাচ্ছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বিগত কয়েক দশকে চিরাচরিত পালন পদ্ধতির পরিবর্তে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পশুপাখি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পশুপাখির খাদ্য, ঔষধ ও প্রজনন সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। এসকল উপকরণ দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। ফলশ্রুতিতে এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। এটা প্রমাণিত যে, পশুপাখির উৎপাদন দক্ষতা তাদের খাদ্যের গুণগতমানের ওপর নির্ভরশীল। তাই খাদ্যের পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন ব্যয় কমানোর মাধ্যমে এই খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করা যায়। তাই 'মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' স্থাপিত হলে প্রাণিসম্পদ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ করে মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় যেসকল গবেষণাগার আছে সেগুলো উৎপাদন উপকরণ ও প্রানিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই 'মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' তে প্রাণিসম্পদের সকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত রোগ, রোগ জীবানু, রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে। এই গবেষণাগার কেন্দ্রীয় অথরিটি হিসেবে পদক্ষেপ নিবে এবং অন্যান্য গবেষণাগারের সাথে সমন্বয় সাধন করবে। প্রাণিসম্পদ খাতের উপকরণ আমদানি, রপ্তানী, বিপনন, বাজারজাতকরণ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এই গবেষণাগারের প্রত্যয়নপত্রকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে উপকরণের গুণগত ও পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সর্বশেষ জীব কলাকৌশল সম্পর্কিত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

মডিউলটি সংকলন ও প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

প্রশিক্ষণ মডিউল

সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	স্থাপিতব্য 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' এর পরিচিতি এবং বায়োসেফটি লেভেল অনুযায়ী গবেষণাগারের প্রকারভেদ	১৫
২	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব	২৪
৩	বাংলাদেশে পশুপাখির খাদ্য ও পুষ্টির বর্তমান পরিস্থিতি এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পদক্ষেপসমূহ	৩৬
৪	বাংলাদেশ জৈব প্রাণিসম্পদের পরিপ্রেক্ষিত এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে ঔষধের ব্যবহার ও গুরুত্ব	৪৬
৫	কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গ এবং আমাদের করণীয়	৫২
৬	পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিক গ্রোথ প্রোমোটারের ব্যবহারে জনস্বাস্থ্যের হুমকি	৫৯
৭	পশুপাখি হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং এক স্বাস্থ্য নীতির প্রয়োগ	৬৮
৮	প্রাণিসম্পদের রোগ নির্ণয় ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রেরণ পদ্ধতি	৭৩
৯	খাদ্য সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহ	৮৪
১০	খাদ্যকর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি	৮৮
১১	হ্যাসাপ (HACCP) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ	৯৬
১২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত নীতিমালা	১১০

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৭

পাঠ - ১
স্থাপিতব্য 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' এর পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন (EQCLIFP) প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৬৬১৩.২৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্পের এলাকা	ঃ	সাভার, ঢাকা

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৮০% মানুষ তাদের জীবিকায়নের জন্য প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। সমন্বিত কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রাণিসম্পদ। এই উপখাত মানব খাদ্য হিসেবে প্রাণিজ আমিষ (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের জনসংখ্যা ও অবকাঠামোর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি কমে যাচ্ছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র হ্রাসের পাশাপাশি টেকসই জীবিকায়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। বর্তমানে জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান শতকরা ১.৬৬ ভাগ। বাংলাদেশের মতো কৃষি প্রধান দেশে কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন আজ হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া, প্রাণিজাত খাদ্যের পুষ্টি ও নিরাপত্তায় ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ প্রাণিসম্পদ ও গ্রামীণ মানুষের জীবিকায়ন।

বিগত কয়েক দশকে চিরাচরিত মুরগি পালনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক মুরগি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পশুপাখির ঔষধ, প্রজনন সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এবং সম্পসারণে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক উপকরণ (ঔষধ, প্রজনন উপকরণ, পশুখাদ্য ও খাদ্য উপকরণ, ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসকল উপকরণের দেশের আভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। ফলশ্রুতিতে এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং আমদানীকৃত এসকল পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরী। কেননা গুণগত মান ভাল না হলে এই উপখাতে উৎপাদন, উৎপাদনশীলতার উপর বিরুপ প্রভাব নিশ্চিত এবং বিভিন্ন রোগের প্রতি গবাদি পশুপাখির সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও নতুন রোগের প্রকোপ দেখা

দেয়ার সম্ভাবনা অমূলক নয়। বিশ্বের সকল উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশে এসকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন চলছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশেও প্রাণিসম্পদ উপখাতে ব্যবহৃত এসকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে গুনগতমানের নির্দেশক তৈরি, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারন, মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন, মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী।

গবাদি পশুপাখি লালন পালনে ও এই উপখাতে উন্নয়নে বর্তমানে উদ্যোক্তা, খামারি, গ্রামীণ কৃষক, দুস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও মহিলাদের সচেতনতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে তারা ঔষধ, প্রজনন উপকরণ, পশুখাদ্য ব্যবহারে এসকল উপাদানের গুণগতমান সম্পর্কে সন্দেহাতীত নয়। সুতরাং এই উপখাতে ব্যবহৃত উপকরণের উন্নত মান নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন গুণগতমানের পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব তেমনি অন্যদিকে এই উপখাতের সহিত সম্পৃক্তদের স্বার্থ সংরক্ষণ সহ রূপকল্প-২০২১, এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

আমদানিকৃত প্রাণিসম্পদ উপকরণের মাধ্যমে নতুন রোগ, রোগ জীবাণু, রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এমনকি আভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে। কেবলমাত্র মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এসকল অনুপ্রবেশ রোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজনন উপকরণের (বীজ, ভ্রূণ, প্যারেন্টস্টক ডিম ও বাচ্চা) মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে গরুর মাংস ও বোনমিল এর মাধ্যমে 'ম্যাডকাউ' নামক রোগ বিস্তারের সাথে পৃথিবী পরিচিতি পেয়েছে। অতএব 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

উচ্চমান ও অধিক পরিমাণ দুধ মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য পশুপাখির জন্য গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। এটা প্রমাণিত যে, পশুপাখির উৎপাদন দক্ষতা তাদের খাদ্যের গুণগতমানের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় খাদ্য উপাদানের পেছনে। তাই খাদ্যের পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানোর মাধ্যমে এই খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করা যায়। কেননা খাদ্যের গুণগত ও পুষ্টিগত মান ভাল হলে পশুপাখির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া সরকার খাদ্যের গুনগত মান নিশ্চিত করণে মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করেছে যা বাস্তবায়নে আর্ন্তজাতিক মানের একটি গবেষণাগার স্থাপন খুবই প্রয়োজন। তাই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় একটি মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য, খাদ্যের উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও ফিড এডিটিভস এর পুষ্টিগত ও গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ জরুরী। প্রস্তাবিত মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপিত হলে প্রাণিসম্পদ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ করে মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যাবে যা মানুষের খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া স্থাপিত এই গবেষণাগার বাংলাদেশ ও বহিঃবির্শ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এবং একটি রেফারেন্স গবেষণাগার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

চিত্রঃ প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবিকায়ন।

স্থাপিতব্য 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' এর পরিচিতি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে ৬৪টি জেলা প্রাণি হাসপাতাল, ৯টি এফডিআইএল, ১টি সিডিআইএল, ১টি নিউট্রিশন ল্যাব, ১টি পাবলিক হেলথ সেকশন এবং ১টি মান নিয়ন্ত্রণ শাখা চলমান আছে। এসকল গবেষণাগারে কেবলমাত্র কিছু রুটিন পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। যা বিশ্বের অন্যান্য গবেষণাগারের স্ট্যান্ডার্ড এর সমকক্ষ নয় এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বর্তমানে মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক সচেতন হয়েছেন এবং গবাদি পশুপাখি লালন পালনেও উন্নত উপকরণের নিশ্চয়তা চায়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাণিসম্পদের সকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত রোগ, রোগ জীবাণু, রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে। এই গবেষণাগারটি কেন্দ্রীয় অথরিটি হিসেবে পদক্ষেপ নিবে এবং অন্যান্য গবেষণাগারের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এমনকি এই গবেষণাগারে পরীক্ষা ফি, এনালাইসিস ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের পথকেও সুগম করবে। প্রাণিসম্পদ খাতের উপকরণ আমদানি, রপ্তানী, বিপণন, বাজারজাতকরণ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এই গবেষণাগারের প্রত্যয়নপত্রকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে উপকরণের গুনগত ও পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন তরান্বিত হবে। যা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। সুতরাং বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

সাধারণ উদ্দেশ্য:

প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত উপকরণ (পশুপাখির খাদ্য, ঔষধ, প্রজনন উপকরণ) ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করা এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাছাড়া গুনগতমান সম্পন্ন মাংস ও মাংসজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ:

ক) প্রাণিসম্পদের খাদ্য ও ফিড এডিটিভস্ এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা।

খ) ঔষধ, হরমোন, স্টেরয়েড ও তার রেসিডিউ এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা।

গ) বেসকরকারী খাতে গুণগতমান সম্পন্ন পশুপাখির খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের জন্য গবেষণাগার পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ প্রদান করা।

ঘ) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা করা।

ঙ) প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত এর রুটিন এনালাইসিস পরিচালনা করা।

চ) গুণগতমান সম্পন্ন পশুপাখির খাদ্য ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরি করা।

চিত্রঃ ঢাকার সাভারে নির্মাণাধীন 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার'।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

- ৬ তলা বিশিষ্ট একটি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ৪ তলা বিশিষ্ট একটি ডরমিটরি ভবন, বাউন্ডারি ওয়াল, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ডিপ টিউব ওয়েল, ইটিপি (ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ইত্যাদি নির্মাণ
- মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবের জন্য যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কেমিক্যাল ও রিয়েজেন্ট ক্রয়।
- মাঠ পর্যয়ের কর্মকর্তা (৫০০ জন) ও কর্মচারীদের (৫০০ জন) ২ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ
- ১০ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৩২ জন কর্মচারীকে দেশে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- ১ টি জীপ, ১ টি পিকআপ, ১ টি মাইক্রোবাস ও ৫ টি মোটর সাইকেল ক্রয়

এখানে উল্লেখ্য যে, স্থাপিতব্য 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' BSL-2 মানের হবে।

Bio-Safety Level (BSL) অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার গবেষণাগারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য

গবেষণাগারের প্রাকটিস, জীবাণুর সংক্রামতা, নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণাগারের ফ্যাসিলিটির উপর ভিত্তি করে গবেষণাগারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সকল প্রকার গবেষণাগারের জন্য আদর্শ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পদ্ধতি সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল।

- গবেষণাগার পরিচালককে গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
- গবেষণাগারে কর্মরত প্রত্যেকেরই প্রবেশের পূর্বে এবং পরে নিয়ম অনুযায়ী হাত পরিষ্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গবেষণাগারের ভিতরে কোন প্রকার খাবার খাওয়া, পান করা কিংবা চোখের কন্টাক লেন্স সরানো, ত্বকের ব্যবহারকারী প্রসাধনী কিংবা খাবার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে না। খাবার গবেষণাগারের বাইরে আলাদা কোথাও গ্রহণ বা সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য ব্যবহৃত রেফ্রিজারেটর বা কেবিনেট ভিন্ন হতে হবে।
- মুখ দিয়ে কোন দ্রাবক উঠানো (mouth pippeting) যাবে না, সকল ধরনের দ্রাবকের জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।
- ধারালো সুচ, স্কালপেল বা ভাঙ্গা কাঁচের জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য বিশেষ নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গবেষণাগার প্রধান তার গবেষণাগারের জন্য নিরাপদ নীতিমালা তৈরি করে সকল ধরনের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ

রাখবেন। যথা সুচের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা তৈরি করা, সুচকে কখনো ভাঙ্গা বা বাকানো যাবে না এবং একবার ব্যবহার করতে হবে।

- ডিসপসিবল সিরিঞ্জ এর জন্য শুধু মাত্র সুনির্দিষ্ট চিহ্নিত পাত্র ব্যবহার করতে হবে।
- নন-ডিসপ্রসিবল সিরিঞ্জ অবশ্যই সংগ্রাহক পাত্রে রাখতে হবে যাতে করে জীবাণু নাশ করে পূনরায় ব্যবহার করা যায় (যথা অটোক্লোভ করে)।
- কোন বিষাক্ত কালচার বা ষ্ট্যাক ধ্বংস করতে হলে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে হবে। যথা- ক) ধ্বংস করার জন্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণাগার অবশ্যই গবেষণাগারের অতি নিকটে, ফাটল/ ছিদ্র বিহীন হতে হবে যা সহজে এবং নিরাপদে পরিবহন করা যায়। খ) এই দূষিত পদার্থ পরিবহনে অবশ্যই জীব নিরাপত্তা বিষয়ক আর্ন্তজাতিক বিধি অনুসরণ করতে হবে।
- ভাঙ্গা কাঁচ কখনোই খালি হাতে ধরা যাবে না। ভিতরের দ্রব্যাদি অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কাঁচের পরিবর্তে প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা নিরাপদ।
- যে পদ্ধতিতে ধোঁয়া/ তরলের ছিটা তৈরি হয় তা পরিহার করতে হবে।
- আর্ন্তজাতিক বায়োহেজার্ড এর প্রতীক সম্বলিত পোষ্টার অবশ্যই বাহিরে থাকতে হবে। যেখানে গবেষণাগার পরিচালকের নাম, মোবাইল নম্বর, পরীক্ষার ধরন এবং জীবাণুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকতে হবে। জীবাণুর তথ্যাদি প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী প্রকাশ করতে হবে।
- কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- গবেষণাগার পরিচালক গবেষণাগারে কর্মরত সকলের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। যেকোন ধরনের আধুনিক পরীক্ষার কাজ শুরু করা হলে তা গবেষণাগারে কর্মরত সকলকে অবহিত করতে হবে।
- বিশেষত গর্ভবতী মহিলাদেরকে অবশ্যই ক্ষতিকারক জীবাণু সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

BSL-1 Laboratory

যেসব জীবাণু বা পদার্থ পশুপাখি ও গবেষণাগারে কর্মরত লোকজন ও গবেষণাগারের পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর, সেসব জীবাণু বা পদার্থ যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয় তাকে বিএসএল ওয়ান গবেষণাগার বলে। এ ধরনের গবেষণাগার সাধারণত লোকালয় থেকে পৃথক কোন জায়গায় স্থাপন করা হয় না। সাধারণ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা যেসব নিয়ম কানুন মেনে করা হয় সে মোতাবেকই এই গবেষণাগারের কাজ কর্ম করা হয়। কোন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি বা কোন বিশেষ ধরনের কর্মের বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না। তবে যে কোন বিশেষ পরীক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণাগারে কর্মরত লোকজনকে অবশ্যই সেই 'বিশেষ পরীক্ষার' প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং অবশ্যই মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। নিম্নলিখিত আদর্শ পদ্ধতি, নিরাপদ যন্ত্রপাতি এবং সুবিধাদি বিএসএল ওয়ান গবেষণাগারে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সাধারণত কোন special practice এর প্রয়োজন হয় না।

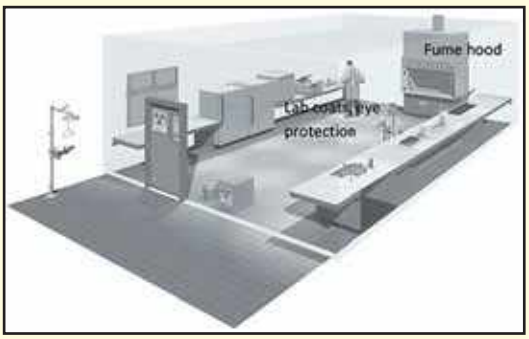

Figure: BSL-1 Laboratory.

Safety Equipment (Primary Barrier and Personal Protective Equipment)

- কোন বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা মূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না।
- ব্যক্তিগত পোষাক পরিচ্ছদ নিরাপদ রাখার জন্য বিশেষ পোষাক/এপ্রোন বা কোট ব্যবহার করতে হয়।
- কেউ কন্টাক লেন্স ব্যবহার করলে তাকে অবশ্যই জীবাণু প্রতিরোধী চশমা ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে যখন কোন বিশেষ জীবাণু বা আলোকউজ্জ্বল কোন পরীক্ষার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- যে কোন সংক্রামক জীবাণু নিয়ে কাজ করার সময় হ্যান্ড গ্লোবস ব্যবহার করতে হবে। কাজ শেষে অবশ্যই হাত পরিষ্কার করতে হবে।
- যখন কোন দূষিত পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় তখন অবশ্যই হ্যান্ড গ্লোবস ব্যবহার করতে হবে।
- ডিসপজিবল গ্লোবস পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।
- গবেষণাগারে প্রবেশের পূর্বে এবং পরে অবশ্যই হাত পরিষ্কার করতে হবে।

Laboratory Facility (Secondary Barrier)

- গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।
- গবেষণাগারে অবশ্যই হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সমস্ত শরীর পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কোন ধরনের কার্পেট থাকা যাবে না।
- গবেষণাগারের ভিতরের সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্রের মাঝে পর্যাপ্ত দূরত্ব থাকতে হবে যাতে করে ভালভাবে পরিষ্কার করা যায়। বিশেষ করে টেবিলের উপরের অংশ যা অবশ্যই এন্টিসেপটিক বা এসিডরোধী হতে হবে।
- গবেষণাগারের চেয়ারগুলো অবশ্যই ছিদ্রবিহীন হতে হবে, যেন সহজে পরিষ্কার করা যায়।
- গবেষণাগারের জানালা সমূহ যা বাহিরের সাথে যুক্ত থাকে তা অবশ্যই পরিষ্কারক নেট দ্বারা পূর্ণ থাকতে হবে।

BSL-2 Laboratory

বিএসএল টু গবেষণাগারের ধরন বিএসএল ওয়ান এর মতই তবে মানব দেহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করে। গবেষণাগার কর্মীদের সংক্রামক জীবাণু নিয়ে কাজ করার প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর সাথে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী গবেষণাগারের কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন। সকল সংক্রামক দ্রব্যাদির অংশ অবশ্যই নির্ধারিত স্থানে রেখে তা ধ্বংস করতে হবে।

Special Requirements

- গবেষণাগার পরিচালককে গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গবেষণাগারে কর্মরত সকলকে ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্যাদি / জীবাণু সম্পর্কে জানাতে হবে এবং নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং বাহিরের পথ অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- গবেষণাগারে কর্মরত সকলকে মেডিক্যাল সার্ভিল্যান্স এর আওতায় থাকতে হবে, বিশেষ করে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ সকল জীবাণুর টিকা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ে নিয়মিত কাজ করেন তাদের রক্তের সেরামের এন্টিবডির মাত্রা নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাপতে হবে।
- গবেষণাগারের জন্য আধুনিক বায়োসেফটি ম্যানুয়েল তৈরি ও পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কাজ শুরুর পূর্বে গবেষণাগারের ব্যবস্থাপক মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কাজের সার্বিক ব্যবস্থা সঠিক আছে কি তা পরীক্ষা করে দেখবেন।
- গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি সমূহ নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা দূষিত দ্রব্যাদির পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গবেষণাগার থেকে কোন যন্ত্রপাতি সংযোজন বা প্রতিস্থাপন করার পূর্বে অবশ্যই জীবাণুনাশক দ্বারা পরিস্কার করতে হবে।

Laboratory Facility

যে কোন দুর্ঘটনায় দূষণের মাত্রা নিরূপন করে গবেষণাগারে কর্মরত সকলের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সু-ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোন দুর্ঘটনার বাস্তব সমীক্ষা গবেষণাগার সুপারভাইজার এর কাছে থাকতে হবে এবং মেডিক্যাল, সার্ভিল্যান্স ও চিকিৎসা রেকর্ড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সকল প্রাণী বা বৃক্ষ যার সাথে গবেষণাগারের কোন সম্পর্ক নেই তা গবেষণাগারে প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত সুবিধাদি থাকা আবশ্যক-

- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকতে হবে।
- হ্যান্ডগ্লাবস শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করতে হবে। হ্যান্ডগ্লাবস পরিধানের আগে ও পরে অবশ্যই হাত জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। সংক্রমিত প্রাণী পরিবহনের সময় চোখ মুখ ও শ্বাসতন্ত্র প্রতিরোধী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গবেষণাগারের দরজা সংলগ্ন বেসিন থাকতে হবে। বেসিনটি যান্ত্রিক বা হাত দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। গবেষণাগার দ্রুত এবং সঠিকভাবে নিয়মিত পরিস্কার করার সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন ধরনের কার্পেট ব্যবহার করা যাবে না।
- গবেষণাগারে সকল যন্ত্রপাতির জন্য পর্যাপ্ত জীবাণুনাশকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। গবেষণাগারের বাহিরের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী জানালা সমূহ অবশ্যই সূক্ষ্ম নেটের (হেপা ফিল্টার) ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- গবেষণাগারে কোন প্রকার ভেনটোলিটরের প্রয়োজন নেই তবে যদি রাখা হয় তবে তা অবশ্যই একমুখী হয়ে প্রবাহিত করতে হবে।
- গবেষণাগারের মেঝে অবশ্যই পিচ্ছিলতা প্রতিরোধী হতে হবে।

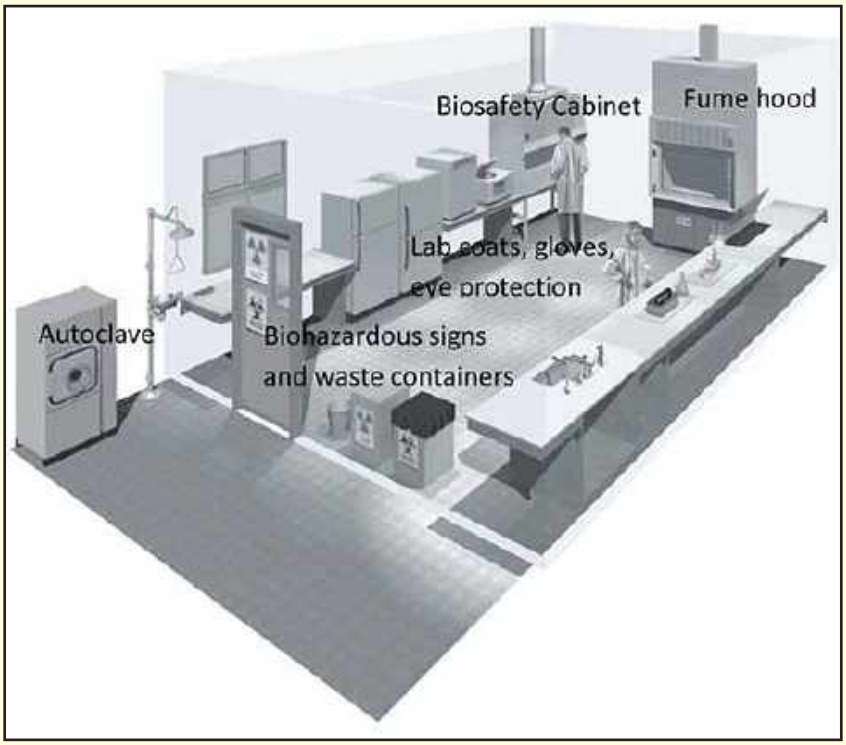

Figure: BSL-2 Laboratory.

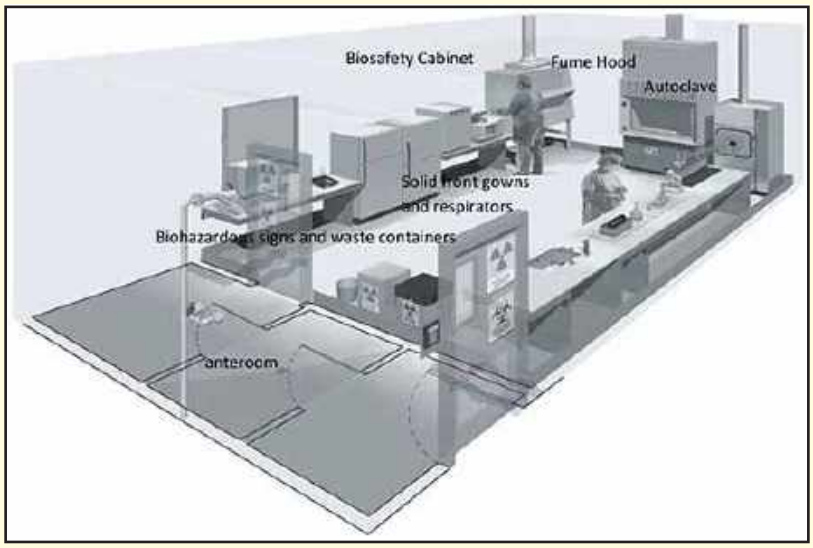

Figure: BSL-3 Laboratory.

BSL-3 Laboratory

ক্লিনিক্যাল বা ডায়াগনষ্টিক, শিক্ষা গবেষণা বা উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য বিএসএল থ্রি মানের গবেষণাগার ব্যবহার করা হয়। এখানে বিশেষত জীবাণু এবং ক্ষতিকর দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করা হয়। যেমন এই সকল দ্রব্যের গ্যাসসমূহ শ্বাস নালিতে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে দিতে পারে, গবেষণাগারে কর্মরত সকলকেই এই বিষয়ে অবহিত করতে হবে। যারা সরাসরি এই সকল বিষয় নিয়ে কাজ করবেন তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ধরনের গবেষণাগার নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী দ্বারা পরীক্ষিত হতে হবে। অন্যান্য সাধারণ বিষয়াবলী একই রকম। তবে বিশেষ ভিন্ন দিকগুলো নিম্নরূপ-

- গবেষণাগার সুপারভাইজার তার গবেষণাগারে কর্মরত সকলের ক্ষতিকর বা সংক্রামক জীবাণু নিয়ে কাজ করার দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- গবেষণাগারে কর্মরত সকলের পোষাকের সম্মুখ অংশ অবশ্যই শক্ত টাই বা গলার বন্ধনী যুক্ত থাকতে হবে। লন্ড্রিতে যাওয়ার আগে সকল পোষাক অবশ্যই অটোক্লেভ করে জীবাণু ধ্বংস করে পাঠাতে হবে।
- গবেষণাগারে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই পরিধেয় সকল পোষাক পরিবর্তন করতে হবে। গবেষণাগারে বাতাসের প্রবাহ পরিষ্কার হতে দূষিতের দিকে প্রবাহিত হবে। কখনই গবেষণাগারে বাতাসের প্রবাহ এক কক্ষ হতে অন্য কক্ষে প্রবাহ করা যাবে না।
- প্রতি বৎসর যন্ত্রপাতি সমূহের কর্মদক্ষতার সার্টিফিকেট নিতে হবে এবং তা প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।
- যে কোন যন্ত্রপাতির ব্যবহারকাল শেষ হলে তা অবশ্যই জীবাণুমুক্তকরণের পরই বাহিরে বের করার অনুমতি প্রদান করতে হবে।
- গবেষণাগারের সকল কর্মকান্ড আর্ন্তজাতিক পরিবেশ আইন অনুযায়ী হতে হবে।

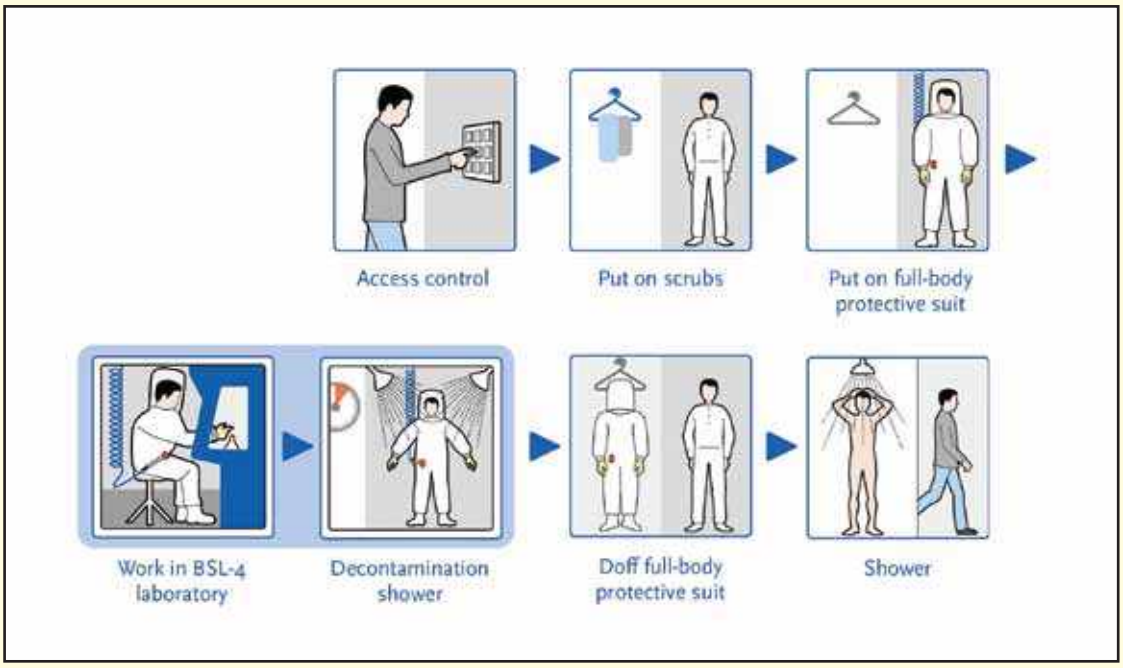

Figure: BSL-4 Laboratory showing safety measures.

BSL-4 Laboratory

যে সকল গবেষণাগারে অত্যন্ত বিপদজনক জীবাণু এবং দ্রব্যাদি (যা সহজেই উদ্বায়ী হয়ে জীবন নাশ করে দিতে পারে) নিয়ে কাজ করে তাই হচ্ছে BSL-4 গবেষণাগার। এ ধরনের গবেষণাগারের সকলকেই সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষতা থাকতে হবে। এই জাতীয় গবেষণাগারের কাজ দেশের সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। এ ধরনের গবেষণাগারের বিশেষ দিক সমূহ নিম্নরূপঃ

- যারা এই গবেষণাগারে প্রবেশ করবেন তারা অবশ্যই গবেষণাগার কর্মকান্ডে জড়িত জীবাণুর ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।
- সুনির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশের পূর্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যিনি সেই কক্ষের প্রধান তার উপস্থিতিতেই প্রবেশ করতে পারবেন।
- গবেষণাগারে প্রবেশের পূর্বে সকলকেই সমস্ত পোষাক (অন্তর্বাসসহ) নির্দিষ্ট কক্ষে পরিবর্তন করে প্রবেশ করতে হবে।
- যখন গবেষণাগারে পূর্ণ কর্মকান্ডে থাকে তখন অবশ্যই গোসল করে বের হতে হবে। প্রতিদিনের কাপড় অটোক্লেভ করে লন্ড্রিতে প্রেরণ করতে হবে। গবেষণাগরের পোষাক কখনই বাহিরের পোষাকের সাথে মিলানো যাবে না।
- গবেষণাগারের ভিতরে জীবন রক্ষাকারী বস্তুসমূহ থাকতে হবে।
- পোষাক পরিবর্তনের স্থনে অবশ্যই ফিউমিগেশন, ডাবল ডোর চেম্বার এর ব্যবস্থা থকতে হবে। প্রতিদিন এই সব ব্যবস্থার অবস্থা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- সংক্রামক জীবাণু নিয়ে কাজ করার সময় বাতাসের বাধার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মারাত্মক ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ে কাজ করার সময় প্রত্যেক কর্মীকে অবশ্যই একটি ধনাত্মক বায়ুপূর্ণ পোষাক পরিধান করতে হবে।

পাঠ - ২
খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব

পৃথিবীতে বহু ধরনের পশুপাখি রয়েছে। আদিকাল থেকেই বিভিন্ন পশুপাখি মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে আসছে। বন্য পশুপাখিকে গৃহে পোষ মানিয়ে লালন পালন করা থেকেই পশুপাখি পালনের উৎপত্তি। যে সকল পোষা পশুপাখি মানুষের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং উপকার লাভ করা যায় তাদেরকে প্রাণিসম্পদ বা livestock বলা হয়। বাংলাদেশে মানুষ যেসব প্রাণিসম্পদ পালন করছে তাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রাণিসম্পদ আমাদের জীবনে নিম্নোক্তরূপে অবদান রাখে।

- **খাদ্যের উৎস:** প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস প্রধানত দুধ, মাংস, ডিম যার সিংহভাগ আসে প্রাণিসম্পদ থেকে। প্রাণিজ খাদ্য শুধু প্রোটিনের উৎসই নয় বরং এসব খাদ্য সুপাচ্য ও প্রায় সকল মানুষের নিকট অত্যন্ত রুচিকর ও সুস্বাদু।

- **শক্তির উৎস:** বিভিন্ন কাজে মানুষ গৃহপালিত গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া ও উট ইত্যাদি শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক যুগে মানুষ ও জন্তুর পরিবর্তে যন্ত্রের প্রবর্তন হলেও আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনও অনেকাংশে গো-শক্তির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে হাল চাষ ছাড়াও গ্রামীণ পরিবহন, ফসল মাড়াই, ঘানি টানা ইত্যাদি কাজেও ব্যাপকভাবে গরু, মহিষ ও ঘোড়া ব্যবহার করা হয়।

- **পোষাক-পরিচ্ছদের উৎস:** পশুর চামড়া, লোম, পশম ও মোহেয়ার (mohair) মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পোষাক ও জিনিস তৈরিতে ব্যবহার হয়। পশুর চামড়া থেকে জুতা, সেন্ডল, সুটকেস, বেল্ট ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরি হয়। পশম থেকে বিভিন্ন ধরনের কম্বল তৈরি হয়। এছাড়া ঠান্ডা দেশের উপযোগী গরম পোষাক তৈরিতে কোমল লোমবিশিষ্ট পশুচর্ম (fur) ব্যবহার হয়।

- **শ্রান্তি বিনোদনের উৎস:** গৃহপালিত পশু বিশেষ করে ঘোড়া, কুকুর ও বিড়াল চিত্ত-বিনোদনে ব্যবহার হয়। ঘোড়ার দৌড়বাজি (race), মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, ষাঁড়ের দৌড়বাজি ইত্যাদি মানুষের কতিপয় শ্রান্তি বিনোদন। অনেক মানুষ আবার পোষা কুকুর, বিড়াল ও কতিপয় ফ্যান্সি পাখি পালন করে আনন্দ পায়।

- **পশুপাখি অখাদ্যকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রূপান্তর করে:** পশুপাখির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্য মানুষের খাবারের উপযোগী নয়। যেমন- খড়, ঘাস, কৃষি উপজাত ভূষি, কুঁড়া ইত্যাদি। এছাড়া পশুপাখিকে কিছু দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয় তাও নিম্নমানের। অপরদিকে এসব পশুখাদ্য রূপান্তরিত হয়ে উৎপন্ন হয় মাংস, দুধ ও পশম।

- **জৈব সারের উৎস:** মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা ও শস্যের ফলন বৃদ্ধিতে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। পশুপাখির খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মল-মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

- **জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার:** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গোবর শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এতে জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমে গাছ নিধন হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকতে সাহায্য করছে।

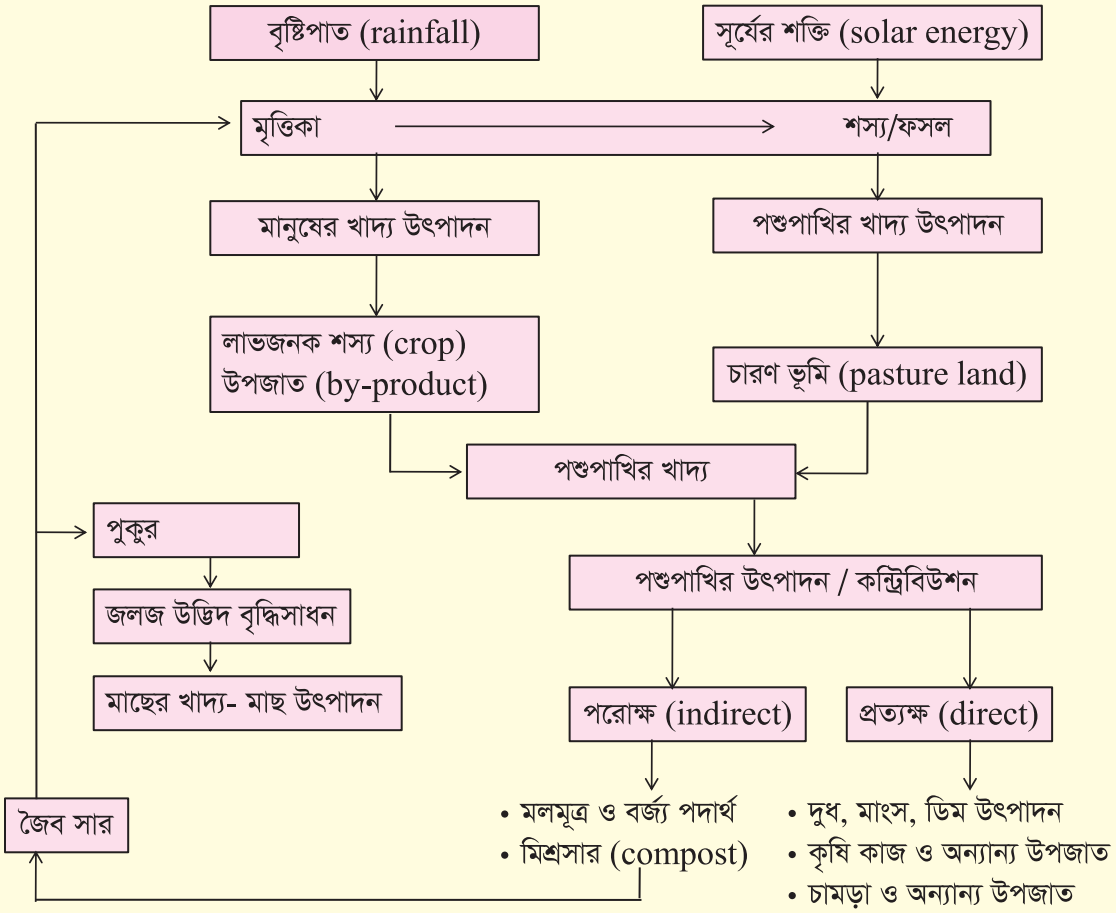

চিত্রঃ প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব। এই চিত্রটি 'পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা' বই থেকে নেয়া হয়েছে (সামাদ ২০০১)।

- **অন্যান্য ব্যবহার:**
  - ✓ অস্থি (bone)- বোতাম, আঠা (glue) এবং পশুপাখির খাদ্য হিসেবে অস্থি ব্যবহার হয়।
  - ✓ চর্বি (fats)- খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়া পশুপাখির চর্বি রাসায়নিক পদার্থ, মলম, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ও সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়।
  - ✓ গ্রন্থি (glands)- গ্রন্থির নিষ্কাশন ঔষধ তৈরি ও ফুড অ্যাডেটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়।
  - ✓ অন্ত্র ও পাকস্থলী- কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, চিল, কাক, শকুন ইত্যাদি প্রাণির খাদ্য।
  - ✓ গবেষণাগারের পশুপাখি (laboratory animals)- ইদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণী গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।
  - ✓ কতিপয় পশুপাখি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ মেরে ও খেয়ে সাহায্য করে।
- **ইন্টিগ্রেটেড খামারের আয়ে পশুর অবদান**
  - ✓ চাষকৃত ফসল বা ঘাসকে পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পশুর উৎপাদনে রূপান্তরিত করা।
  - ✓ চাষের অযোগ্য এলাকার ঘাস বা অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জঙ্গল পশুর চারণের মাধ্যমে পরিষ্কার রাখা যায়।
  - ✓ মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী শস্যের উপজাত পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পশুর উৎপাদন (মূল্যবান আমিষে রূপান্তরিত) বৃদ্ধি করা হয়।
  - ✓ পশু শিল্পে সারা বছর সমভাবে শ্রমিকের কাজের সংস্থান হয়।

সারণিঃ বাংলাদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যান।*

ক্রমিক	পশুপাখি	সংখ্যা (লক্ষ)
১	গরু	২৩৭.৮৫
২	মহিষ	১৪.৭১
৩	ছাগল	২৫৭.৬৬
৪	ভেড়া	৩৩.৩৫
৫	হাঁস	৫২২.৪০
৬	মুরগি	২৬৮৩.৯৩

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্য।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় পশুপাখির অবদান

জনগণের সুস্বাস্থ্য হচ্ছে একটি দেশের সম্পদ। সব সময়ে সব মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার বিপরীতে পছন্দমত পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বাস্তব ও আর্থিক ক্ষমতা থাকার নাম খাদ্য নিরাপত্তা। খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজমান যখন সবার কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের সহজলভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অধিক মাত্রায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ যথা- বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কৃষি, বন ও মৎস্য সম্পদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে এবং খাদ্য উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী দেশের ৫০% পরিবার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে, ২৫% পরিবার নিয়মিতভাবে সারা বছর খাদ্য সংকটে থাকে, ১৫% পরিবার সব সময় পরবর্তী বেলার খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং ৭% মানুষ কখনই ৩ বেলা খেতে পায় না। বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে এদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। বেঁচে থাকা শিশুর অর্ধেকের বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। ছোট বাচ্চারা অপুষ্টিজনিত নানাবিধ রোগে ক্রমাগতভাবে ভোগে এবং তাদের দৈহিক বৃদ্ধি অত্যন্ত শ্লথ হয় ও বুদ্ধি এবং মননের বিকাশ ঘটে না। এ সমস্তই ভবিষৎ প্রজন্ম তথা সমগ্র জাতির জন্য উদ্বেগের বিষয়। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, শৈশবে আমিষ ও বিপাকীয় শক্তির ঘাটতি বেশি হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে শিশুদের মস্তিষ্ক সঠিকভাবে গঠিত হয় না এবং পরবর্তীতে ঘাটতি পূরণ হলেও মস্তিষ্কের এ ক্ষতি আর পূরণ হয় না। ফলে তাদের মেধা অবিকশিত থেকে যায়। অপুষ্টির কারণে বাড়ন্ত ও বয়স্ক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ফলে মানুষ অলস ও কর্মহীন হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ট হয় না, চিন্তা শক্তি লোপ পায়, ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও অদৃষ্টবাদী হয় এবং নৈতিকতা বর্জিত কাজে লিপ্ত হয়। জাতীয় উন্নয়নে এটা এক বিরাট বাধা। জনগোষ্ঠির ওপর পুষ্টিহীনতার প্রভাব নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত হল-

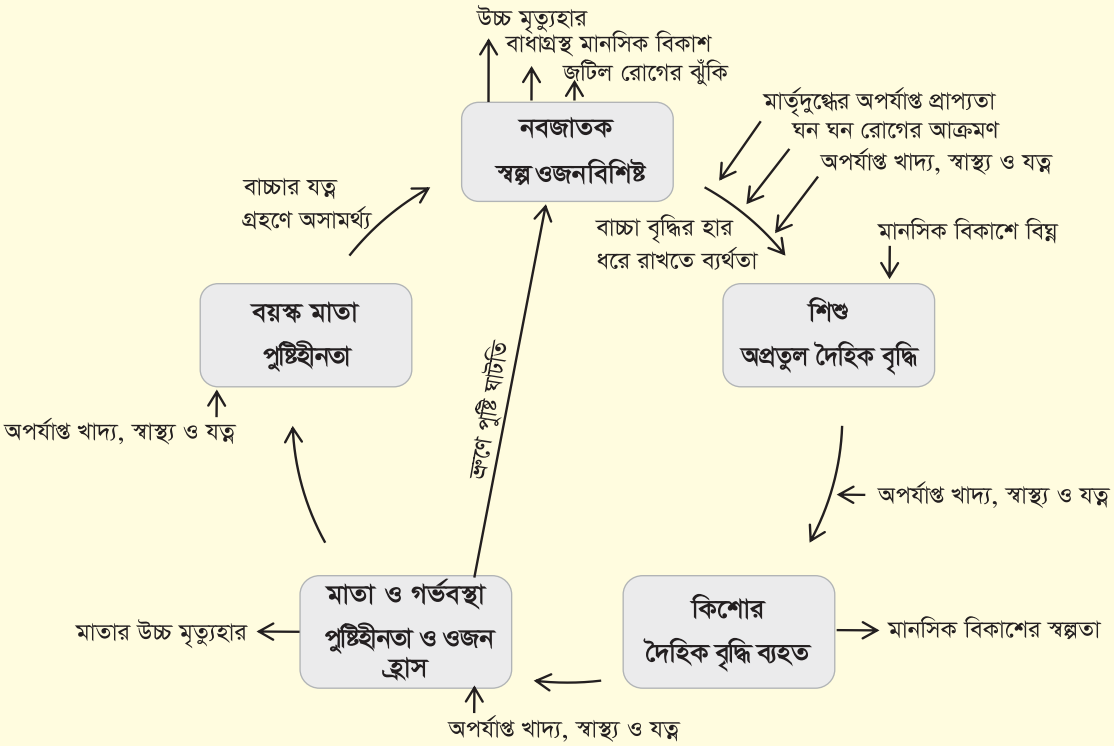

চিত্রঃ মানব জীবনে পুষ্টিহীনতার বিরুপ প্রতিক্রিয়া। United Nations Administrative Committee on Coordination কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত চিত্রটি এখানে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে (SCN 2000)।

আমাদের জাতীয় খাদ্য নীতিতে (২০০৬) খাদ্য নিরাপত্তায় চিহ্নিত তিনটি নিয়ামক হল- খাদ্যের সহজলভ্যতা (availability of food), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food)। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে সব কয়টি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পারিক নির্ভরতা বিদ্যমান থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত সব বিষয়ের মধ্যে সুষম ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। খাদ্য নিরাপত্তার উপরোক্ত তিনটি নিয়ামক বিবেচনায় নিয়ে বৃটেনের প্রভাবশালী সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তৈরি 'দ্য গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১২' বা বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা তালিকা-২০১২ তে বিশ্বের ১০৫ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। উক্ত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে মানুষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা ১ গ্রাম। একজন বয়স্ক বাংলাদেশীর গড় ওজন ৫৫ হতে ৬০ কেজি হলে তার জন্য দৈনিক আমিষের চাহিদা হবে ৫৫ থেকে ৬০ গ্রাম। প্রাণিজ আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ আমিষে মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডের উপস্থিতি কম থাকে। তাই পুষ্টিবিদগণ দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী মোট আমিষের কমপক্ষে ৩০-৫০% প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের পরামর্শ দেন। বিশেষ করে প্রসূতি মা ও শিশুদের খাদ্যের অর্ধেক আমিষ প্রাণিজ উৎস থেকে হওয়া বাঞ্চণীয়। উন্নত বিশ্বে জনপ্রতি আমিষের মোট চাহিদার ৭০% প্রাণিজ আমিষ থেকে সরবরাহ করা হয় অথচ বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ১০-১২%। উদ্ভিজ আমিষের তুলনায় প্রাণিজ আমিষের জৈবমূল্য বেশি এবং প্রাণিজ আমিষে সকল বয়সের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডগুলো বিদ্যমান থাকে। আর এই প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস হল দুধ, ডিম ও মাংস যেগুলো গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী দৈনিক ২৫০ মিলি দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস এবং বছরে ১০৪ টি (দৈনিক ১৬ গ্রাম) ডিম থেকে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮-৪০ গ্রাম। কয়েকটি খাদ্যের আমিষের জৈবমান সারণিতে উল্লেখ করা হল।

সারণিঃ কয়েকটি খাদ্যের আমিষের জৈবমান (biological value) ।*

ক্রমিক	খাদ্যের নাম	জৈবমান (%)
১	মানুষের দুধ	৯৬
২	গরুর দুধ	৮৯
৩	ডিম	৯৫
৪	মাছ	৯০
৫	মাংস	৮১
৬	চাল	৬৮
৭	গম	৬৩
৮	আলু	৭৩
৯	মশুর ডাল	৫৫
১০	মুগ ডাল	৬০
১১	ছোলা	৭৫
১২	সয়াবিন	৭৬

*ড. মামুনুর রশিদ এর বই থেকে নেয়া হয়েছে (রশিদ ২০০৩) ।

সুস্থ জীবনের জন্য মানুষের যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশির ভাগই প্রাণিজ প্রোটিনে বিদ্যমান। প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হচ্ছে- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি এবং কবুতরসহ নানা জাতীয় পাখি। প্রাণিজ প্রোটিন মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ভর করে সুস্থ সবল জনগোষ্ঠির ওপর। তাই সুস্থ-সবল জাতিসত্ত্বা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ। গত দুই দশকে মানুষের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য মুরগীর ডিম এবং গরুর দুধ ও মাংসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে অনেকাংশে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ডিম ও দুধ উপাদন হয় বর্তমান লোকসংখ্যার তুলনায় তা অনেক কম। কারণ যে হারে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে সেই অনুপাতে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তবে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমিষের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

দুধের পুষ্টি

দুধ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাবার। ইহা সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর যা নিয়মিত পান করলে মেধা, মনন ও বল বৃদ্ধিসহ শারীরিক গঠন সুদৃঢ় হয়। শিশু, তরুণ-তরুণী, বয়স্ক ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই এটি আদর্শ খাদ্য। শিশুদের জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। এটি সর্বজনস্বীকৃত এবং বিশ্বের সবদেশে এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। কিন্তু এর পাশাপাশি বয়সের সাথে সাথে গড়ে ওঠা শিশুর পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ও যেখানে মাতৃদুগ্ধের অভাব রয়েছে সেখানে এবং সেই সাথে পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের চাহিদায় গবাদিপশুর দুগ্ধ প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে। দুধে রয়েছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান ল্যাকটোজ যা শিশুর মস্তিষ্ক বর্ধণে সহায়তা করে থাকে। দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে ল্যাকটোজ নেই। জন্মের পর ছয়-সাত বছরের মধ্যেই মানব শিশুর মস্তিষ্কের প্রায় ৯০% বর্ধন শেষ হয়ে যায়। তাই শিশু অবস্থায় দুধের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া দুধে রয়েছে উন্নত মানের আমিষ যার মধ্যে সব অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বিদ্যমান থাকায় যে কোন আমিষের তুলনায় এটিকে শ্রেষ্ঠ আমিষ বলা যায়। উদ্ভদ আমিষে লাইসিন, মিথিওনিন ও সিসটিনের অভাব রয়েছে বিধায় বাচ্চাদের সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত দুধ পান করানো উচিত। অনুরূপভাবে দুধের চর্বিতে অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিডসহ (লিনোলিক ও লিনোলেনিক এ্যাসিড) অন্যান্য ফ্যাটি এসিডগুলোও আছে। দুধের চর্বিতে প্রায় ৪০% অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এবং প্রচুর পরিমাণে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড বিদ্যামান থাকার জন্য

এটি গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগি ইত্যাদির মাংসের চর্বির তুলনায় প্রায় ৫০% নিরাপদ। তাছাড়া দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়ামসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ। যার ফলে শিশুর সঠিক সময়ে দাঁত ওঠা, শরীরের অস্থির কাঠামো গঠন এবং বয়স্কদের অস্টিওপেরোসিস প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। রাতে ঘুমের আগে এক গ্লাস দুধ খেলে ভাল ঘুম হয় এবং হাইপারটেনশন কমাতে এটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন জাতের ভিটামিন যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া দুধে বিদ্যামান বিভিন্ন ধরনের বায়ো-এ্যাকটিভ উপাদান ও কনজুগেটেট লিনোলেনিক এসিড (CLA) যা মানব দেহে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চিত্রঃ মানুষের আদর্শ খাদ্য দুধ।

বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের অবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশে দুধের পরিমাণগত উৎপাদন প্রায় ৭২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদিত এই দুধ প্রকৃত অর্থে একেবারেই অপ্রতুল এবং এ পরিমাণ দিয়ে দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির ব্যাপক চাহিদা পূরণ আদৌ সম্ভব নয়। এটা জনগণের চাহিদার (বার্ষিক ১৪৬.৯ লক্ষ মেট্রিক টন) মাত্র শতকরা ৪৯.৫ ভাগ। দুধ উৎপাদনের এই বিশাল ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ ঐকান্তিক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারণিঃ বিগত এক যুগে বছরভিত্তিক বাংলাদেশে দুধ উৎপাদন।*

ক্রমিক	বছর	দুধ উৎপাদন (লক্ষ টন)	ক্রমিক	বছর	দুধ উৎপাদন (লক্ষ টন)
১	২০০৪-০৫	২১.৪	৭	২০১০-১১	২৯.৫
২	২০০৫-০৬	২২.৭	৮	২০১১-১২	৩৪.৬
৩	২০০৬-০৭	২২.৮	৯	২০১২-১৩	৫০.৭
৪	২০০৭-০৮	২৬.৫	১০	২০১৩-১৪	৬০.৯
৫	২০০৮-০৯	২২.৯	১১	২০১৪-১৫	৬৯.৭
৬	২০০৯-১০	২৩.৭	১২	২০১৫-১৬	৭২.৭

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য।

FAO এর তথ্য মতে একজন মানুষের গড়ে প্রতিদিন ২৫০ মিলি লিটার দুধ প্রয়োজন, সেখানে আমাদের দেশের লোকেরা পাচ্ছেন গড়ে ১২৫.৬ মিলি লিটার মাত্র। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে ১২৪.৪ মিলি/প্রতিদিন/প্রতিজন। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১ জন দারিদ্র সীমার নিচে আছেন যারা প্রতিদিন ২১০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করেন। আর এ ক্যালরির অধিকাংশই আসে উদ্ভিজ্জাত শর্করা থেকে। সুতরাং সহজভাবেই বোঝা যায়, যারা দারিদ্র সীমার নিচে আছেন তারা সবাই

এক রকম দুধ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। দুধ পানের ইচ্ছে থাকলেও তারা তা পাচ্ছেন না। আবার যারা দারিদ্র সীমার উপরে আছেন, তাদের অনেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দুধ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। তাই চাহিদা অনুযায়ী দুধের প্রাপ্যতা বাড়াতে বার্ষিক দুধের উৎপাদন আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

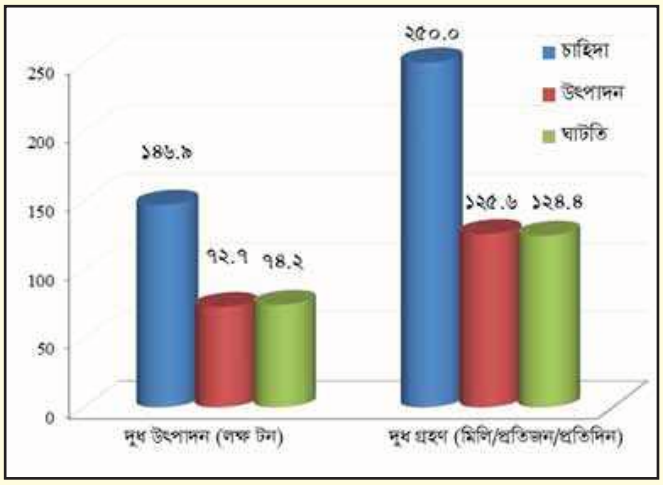

চিত্রঃ বাংলাদেশে বর্তমানে দুধের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি।

বাংলাদেশে দুধের পরিমাণগত উৎপাদন কম হওয়ার কারণে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ গুড়োঁ দুধ আমদানি করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ১৬ টি দেশ থেকে ৫৭ হাজার ৫৩৭ মেট্রিক টন গুঁড়ো দুধ আমদানি করেছে (দৈনিক যুগান্তর, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪)। এই গুঁড়ো দুধের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমদানি করা হয় ভারত থেকে। অন্যান্য দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হল নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রেলিয়া।

মাংসের পুষ্টি

মাংস উচ্চমান সম্পন্ন সহজপাচ্য পুষ্টির উৎস। এতে বিভিন্ন পুষ্টি সাম্যাবস্থায় আছে। প্রতিদিন খাবারে ১০০ গ্রাম রান্না মাংস সরবরাহ করলে দিনের প্রয়োজনীয় আমিষ পাওয়া যায় এবং প্রায় ২০০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। গরু, ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য মাংসের তুলনায় মুরগির মাংসের গুণাবলী অনেক উন্নত মানের। মুরগির মাংসকে সাদা মাংস হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুরগির মাংসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অল্প পরিমাণে চর্বি থাকে যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

মাংসের আমিষঃ মাংসে অপরিহার্য এমাইনো এসিডের পরিমাণ দ্বারা আমিষের পুষ্টির মান ধার্য করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, খাদ্য তালিকায় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস সরবরাহ করা হয় তখন এর আমিষ অন্য কোন প্রতিস্থাপনার আমিষ ছাড়াই বর্ধন ও শরীর বৃদ্ধিতে কাজ চালাতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকা উচিত তা পূরণ করার জন্য মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণ আবশ্যকীয় এমাইনো এসিড আছে। রান্না করার ফলে খুব অল্প পরিমাণ এমাইনো এসিড ক্ষতি হয়।

মাংসের শর্করাঃ মাংসের যে শর্করা থাকে তা মূলত গ্লাইকোজেন। ইহা প্রধানত যকৃতে সঞ্চিত থাকে। দেহের সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের অর্ধেক থাকে যকৃতে এবং বাকি অর্ধেক থাকে মাংস ও রক্তে।

মাংসের চর্বি: বিভিন্ন প্রজাতির চর্বিতে বিভিন্ন রকম পলি সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে যা মানবদেহের অপরিহার্য ফ্যাটি এসিডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন এ, ডি, ই এবং কে এর বাহক এবং দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। একই প্রাণির অথবা একই টুকরার বিভিন্ন রকম অংশে চর্বির পরিমাণ বিভিন্ন হয়। মাংসের চর্বি সহচপাচ্য এবং ৫০% শক্তি সরবরাহ করতে পারে। এছাড়া চর্বি মাংসের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করে।

মাংসের খনিজ পদার্থ: মাংসের খনিজের উপর পরীক্ষা চালাতে গেলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাংস ঠান্ডা করলে বা প্রক্রিয়াজাত করলে খনিজ এর গুণাগুণ বা পরিমাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। ভাল পুষ্টির সাথে যে সকল খনিজ পদার্থ থাকে বা থাকা প্রয়োজন তার সবই মাংসে বিদ্যমান। তাছাড়া মাংস লৌহের একটি উত্তম উৎস যা লোহিত রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে।

সারণিঃ বিভিন্ন প্রজাতির মাংসের পুষ্টিমান।*

পুষ্টি উপাদান	গরু	ছাগল	ভেড়া	মহিষ
পানি (%)	৭৪	৭৪	৭৫	৭৯
আমিষ (%)	২২	২২	২১	১৯
চর্বি (%)	৩	৩	৩	১
খনিজ (%)	১	১	১	১
ভিটামিন এ (মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম)	২০	১০	১০	- -
ভিটামিন সি (মাইক্রোগ্রাম/১০০ গ্রাম)	১৫০০	- -	১০০০	- -
ভিটামিন ই (মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম)	৪০০	৫০০	৫০০	- -

এই সারণির তথ্যাদি ভেড়া পালন ম্যানুয়াল থেকে নেয়া হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৪)।

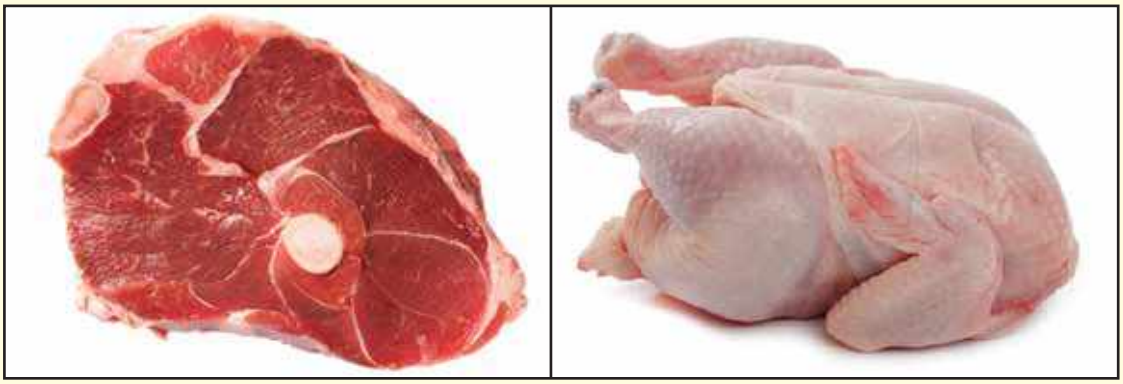

চিত্রঃ উচ্চমান সম্পন্ন সহজপাচ্য পুষ্টির উৎস মাংস।

বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনের অবস্থা

প্রাচীনকাল থেকেই গবাদিপশুর মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আদিম গুহাবাসী মানুষ বেচে থাকার জন্য যেসব খাদ্য গ্রহণ করত তার মধ্যে মাংসই প্রধান ছিল। তারা অবশ্য ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মাংস ভক্ষণ করত। এ যুগে ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও মাংসের পুষ্টিগুণের জন্য খাদ্য হিসেবে এটি গ্রহণ করা হয়। এটি উৎকৃষ্ট আমিষ ও খেতে সুস্বাদু যা দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে। টাটকা মাংসে ১৫-২০% আমিষ থাকে। এতে অতি প্রয়োজনীয় সকল এমাইনো এসিড বিদ্যমান। মাংসের সঙ্গে লাগানো চর্বি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। মাংস খনিজ পদার্থের

উৎস। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে যা দাঁত গঠনে সহায়ক কোষের অভ্যন্তরে ঢুকে তাতে রক্তের ক্ষারতা স্থিতিশীল করে এবং স্নায়ুশক্তি যোগায়। মাংসে লোহা থাকে যা রক্তশূন্যতা দূর করে। ভিটামিনের মধ্যে থায়ামিন, ভিটামিন-বি১২ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে মাংসকে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের উৎস বলে। মাংস থেকে নানাবিধ মজাদার খাবার, যেমন- চপ, কাটলেট, কাবাব, রোস্ট প্রভৃতি তৈরি করা যায়। সুস্থ থাকার জন্য একজন মানুষের প্রত্যেহ ১২০ গ্রাম মাংস খাওয়া প্রয়োজন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক মাংসের চাহিদা ৬৭.৩ লক্ষ মেট্রিক টন (জুলাই ২০১৩ এর জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ধরে হিসাব করা হয়েছে)। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন হয় বছরে ৪৫.২ লক্ষ মেট্রিক টন। সে হিসেবে আমাদের গড় মাংসের প্রাপ্যতা ৮০.৬ গ্রাম/প্রতিদিন/প্রতিজন। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে ৩৯.৪ গ্রাম/প্রতিদিন/প্রতিজন। তাই চাহিদা অনুযায়ী মাংসের প্রাপ্যতা বাড়াতে বার্ষিক মাংসের উৎপাদন আরও ২২.১ লক্ষ মেট্রিক টন বাড়ানো প্রয়োজন। মাংস উৎপাদনের এই বিশাল কার্যক্রম পূরণ করার জন্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ ঐকান্তিক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারণিঃ বিগত এক যুগে বছরভিত্তিক বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন।*

ক্রমিক	বছর	মাংস উৎপাদন (লক্ষ টন)	ক্রমিক	বছর	মাংস উৎপাদন (লক্ষ টন)
১	২০০৪-০৫	১০.৬	৭	২০১০-১১	১৯.৯
২	২০০৫-০৬	১১.৩	৮	২০১১-১২	২৩.৩
৩	২০০৬-০৭	১০.৪	৯	২০১২-১৩	৩৬.২
৪	২০০৭-০৮	১০.৪	১০	২০১৩-১৪	৪৫.২
৫	২০০৮-০৯	১০.৮	১১	২০১৪-১৫	৫৮.৬০
৬	২০০৯-১০	১২.৬	১২	২০১৫-১৬	৬১.৫২

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য।

ডিমের খাদ্যমান (food value of egg)

ডিম এমন একটি প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্য যার গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। সকল বয়সের কাছে এটি একটি উপাদেয় ও পুষ্টিকর বস্তু। ডিমে প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের ও সহজপাচ্য আমিষ আছে। এছাড়া দেহের জৈবিক কার্যাবলীর জন্য যে সকল এমাইনো এসিড অত্যাবশ্যকীয় তা ডিমে বিদ্যমান। ডিম মানুষের খাদ্য সামগ্রীতে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না বরং এরা খাদ্যসামগ্রীকে আনন্দদায়ক ও রুচিদায়ক করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, পোচ্ করা ডিম ৪০ মিনিটের মধ্যে হজম হয় এবং যখন ডিম ভাজা বা পুরোপুরি সিদ্ধ করা হয় তখন হজম হতে ৫০ মিনিটের বেশি সময় লাগে। এখানে ডিমের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ডিমের অ্যালবুমিন: কাঁচা ডিমের এলবুমিনের মধ্যে এক প্রকার ট্রিপসিন বাঁধাদানকারী আছে যা হজম শক্তি নষ্ট করে এবং প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়ে দেয়। উপরন্ত কিছু এলবুমেন অপরিবর্তিত অবস্থায় অন্ত্রের দেয়ালের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং অত্যন্ত অনুভূতিশীল মানুষের ক্ষেত্রে যা বিষাক্ত উপসর্গ সৃষ্টি করে। রান্নার ফলে এ ট্রিপসিন নষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ খাদ্যের হজম ক্ষমতা প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগ হয়। রান্নকৃত ডিমে সাধারণত খাদ্য সামগ্রীর একটি অংশ হিসেবে থাকে এবং যখন এরূপ হয় তখন হজম ক্ষমতা সম্পূর্ণ হয়। ডিমের অ্যালবুমিনের প্রায় সব অংশই পানি এবং আমিষ এবং এর সঙ্গে খুব অল্প পরিমান শর্করা থাকে। এখানে সম্পূর্ণ ডিমের প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ আমিষ থাকে।

ডিমের কুসুম: ডিমের কুসুম এত সহজে হজম হয় যে, এটা দুইমাস বয়স হতেই শিশুদের খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা যায়। খাওয়ার ফলে ডিমে বিদ্যমান চর্বি এবং আমিষ প্রায় সম্পুর্ণরূপে হজম হয়। ডিমের কুসুমের শতকরা ৫০ ভাগ পানি। এখানে চর্বি ও আমিষের অনুপাত ২ : ১।

ডিমের আমিষ: একটি ডিম মানুষের দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড চাহিদার শতকরা ৬ থেকে ১৫ ভাগ সরবরাহ করতে পারে। ডিমের আমিষ বা প্রোটিন মিথিওনিন, ট্রিপটোফেন এবং আংশিক অত্যাবশ্যকীয় আরজিনিনের একটি অত্যন্ত ভাল উৎস। ডিমের আমিষ এবং দুধ ব্যতীত মানুষের অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী এ সকল এমাইনো এসিডের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়।

ডিমের চর্বি বা ফ্যাট: ফ্যাট ডিমের কুসুমেই একমাত্র এবং খুব সুন্দরভাবে বিস্তৃত থাকে। এজন্য তারা খুব সহজে নির্যাসিত (emulsify) ও হজম হয়। দেখা গেছে যে, চর্বির শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ একমাত্র পাকস্থলীতেই হজম হয়। ডিমের চর্বি হচ্ছে প্রকৃত ফ্যাট ও ফসফোলিপিডের মিশ্রণ। মোট চর্বির শতকরা ৬২ ভাগ প্রকৃত ফ্যাট এবং ফসফোলিপিডের (হজম ক্ষমতা ৯১%) চেয়ে অধিক হজম ক্ষমতাসম্পন্ন (শতকরা হজম ক্ষমতা ৯৮%)। সাধারণত তিন ধরনের ফসফোলিপিড পাওয়া যায়। যেমন- লেসিথিন, সেফালিন এবং স্ফিংগনোমাইলিন। লেসিথিন ডিমের কুসুমের শতকরা ৮.৫ ভাগ গঠন করে। লেসিথিন মুরগীর ডিমের ফসফোলিপিডের শতকরা ৬৯ ভাগ এবং হাঁসের ডিমের শতকরা ৮২ ভাগ গঠন করে। মুরগীর ডিমের ফসফোলিপিডের শতকরা ২৫ ভাগ সেফালিন এবং ৩ ভাগ স্ফিংগনোমাইলিন। ডিমে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়, যা অধিকাংশ পরিমাণে স্নায়ু কলায় থাকে এবং যা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যৌন হরমোনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

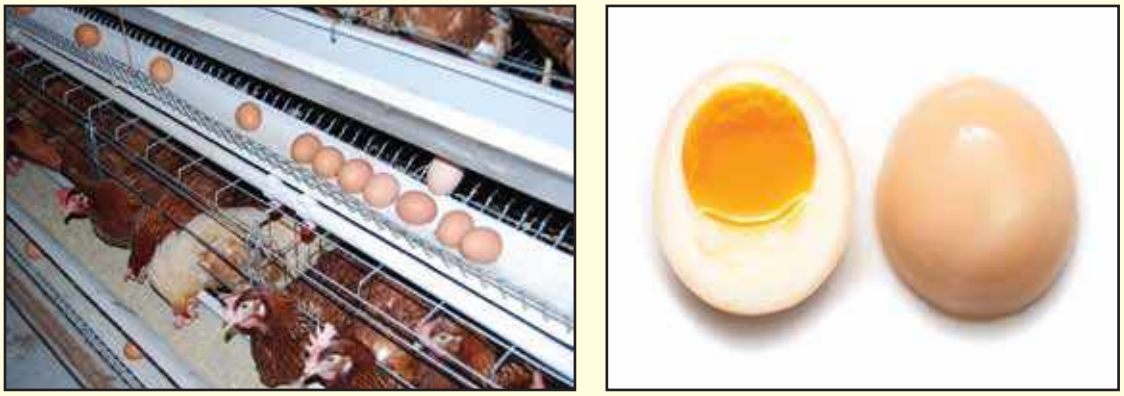

চিত্রঃ সকলের কাছে উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ডিম।

শক্তিমান (energy value): যেহেতু অন্যান্য সাদা খাদ্য সামগ্রীকে যেমন- রুটি, ভাত মানুষের শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে, তাই ডিম সাধারণত মানুষের খাদ্য সামগ্রীতে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। বরং এরা খাদ্য সামগ্রীকে আনন্দদায়ক বা রুচিদায়ক করে। যেমন- রুটি ও ডিম। ডিম পরিপাক রসকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ খাদ্যের হজম ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

খনিজ: ডিম হচ্ছে জৈব ফসফরাস, সালফার এবং পরবর্তীতে মিথিওনিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং পটাশিয়াম ও লৌহসমৃদ্ধ। সিদ্ধ ডিমের কাটা অংশ বায়ুতে উন্মুক্ত হলে যে বিবর্ণ অংশ দেখা যায় তা মিথিওনিনের বিকৃতি এবং মৌলিক সালফার গঠনের জন্য হয়ে থাকে। পঁচা ডিমের ক্ষেত্রে মিথিওনিনের প্রায় সমস্ত অংশই হাইড্রোজেন সালফাইডে পরিণত হয় যা একটি বিষাক্ত পদার্থ এবং যার গন্ধের জন্য পঁচা ডিমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ হয়ে থাকে। ডিমে লৌহের পরিমাণ মুরগির খাদ্রসামগ্রীর উপর নির্ভর করে।

ভিটামিন: ডিমের মধ্যে ভিটামিনের পরিমাণ মুরগির খাদ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুরগীর ডিমে দুই ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায়। যেমন- পানিতে দ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো- এ, ডি, ই এবং কে এগুলো

ডিমের কুসুমে পাওয় যায়। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো- থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নিকোটিনিক এসিড, ইনোসিল, প্যান্টোথেনিক এসিড, পাইরোডক্সিন, ফলিক এসিড এবং ভিটামিন বি১২ এগুলো ডিমের কুসুম এবং অ্যালবুমিন উভয়তেই পাওয়া যায়।

সারণিঃ মুরগি ও জাপানি কোয়েলের ডিমে উপস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার।*

পুষ্টি উপাদান	মুরগির ডিম	কোয়েলের ডিম
পানি (%)	৭৪.০০	৭৩.৮০
আমিষ (%)	১২.৮০	১৩.২৩
চর্বি (%)	১১.৫০	১০.৮৩
ছাই (%)	১.০০	১০৩
শর্করা (%)	০.৯০	১.০২

*উৎসঃ Panda, B.ct al. 1997 quail Production Technology. CARI, India.

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং এখানে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাদ্যের মূল উৎস হিসেবেই শুধু নয় বরং কৃষি কাজের জন্যও এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১.৫০ মিলিয়ন কর্মক্ষম লোক দেশের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। এদের জন্য কাজ দরকার। দেশের আবাদি জমির পরমিাণ মাথাপিছু মাত্র ০.২১ একর। এর সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এজন্য দরকার অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন। এ লক্ষ্যে দেশের প্রাণিসম্পদ বিরাট ভূমিকা রাখছে। আমাদের দেশে এই প্রাণিসম্পদ দুধ, মাংস, ডিম, চামড়া, জ্বালানি, জৈব সার, ভারবহন কাজে শ্রম ইত্যাদি দিয়ে নিম্নোক্তরূপে দেশে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

- দেশের প্রাণিসম্পদ প্রত্যক্ষভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা প্রায় ১.৬৬ ভাগ যোগান দেয় (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্য)। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে জিডিপি নির্ণয়ের সময় প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত খাদ্য ছাড়াও কৃষি খাতে ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে অনেক অবদানকে টাকায় রুপান্তরিত করার সহজ উপায় না পেয়ে এই উপখাতের প্রকৃত অবাদন অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে যা নিতান্তই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। কর্ষণ শক্তি, গ্রামীণ পরিবহন, শস্য মাড়াই, ঘানি টানা, জৈব সার ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গোবর প্রভৃতির সঠিক আর্থিক মূল্যায়ন হলে দেখা যাবে জাতীয় উৎপাদনে প্রাণিসম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান না বাড়লেও এ খাতের ভলিউম বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৬৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।
- দেশের জনসমষ্টির ২০% সার্বক্ষনিক এবং ৫০% খন্ডকালীন পশুপাখি পালনে কর্মরত। গ্রামীণ জনসাধারণের এই বিরাট অংশ বিশেষ করে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের আয়ের প্রধান উৎস হল দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।
- যদিও বর্তমানে কৃষি কাজে যান্ত্রিকীকরণ বাড়ছে তথাপি চাষাবাদে পশুশক্তির অবদান এখনও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে হাল চাষের জন্য কর্ষণ শক্তি ও গ্রামীণ পরিবহনের প্রায় ৫০% ভাগ যোগান দেয় দেশের গো-মহিষ। বছরে প্রায় ২২ মিলিয়ন টন শুকনো গোবর জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করে থাকি (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।

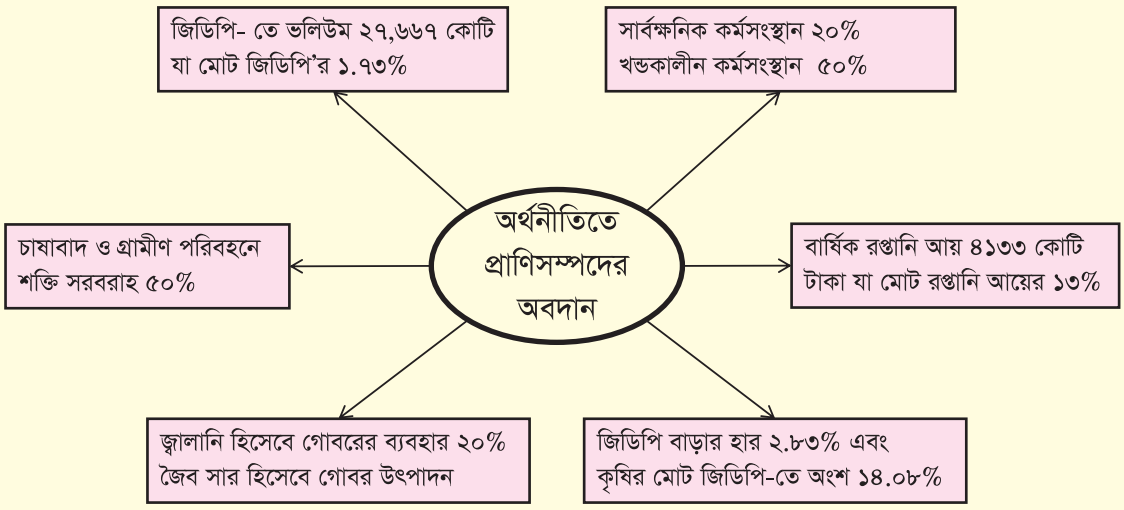

চিত্রঃ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান।

- আমাদের রপ্তানি আয়ে প্রাণিসম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গবাদিপশুর চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য প্রাণিসম্পদজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে ৪১৩৩.৫২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে (Export Promotion Beuro, 2012-13 Summation data) যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭.৮২ ভাগ।

পাঠ - ৩
বাংলাদেশে পশুপাখির খাদ্য ও পুষ্টির বর্তমান পরিস্থিতি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সেই আদিকাল থেকে কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রাণিসম্পদ। গবাদিপশুর ওপর এখন পর্যন্ত গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষি নির্ভরশীল। গবাদিপশু উৎপাদনে চারটি মূল বিষয় হল প্রজনন, খাদ্য, পরিচর্যা ও রোগ-বালাই দমন। তার মধ্যে সবচেয়ে দরকারি হল খাদ্য ও পুষ্টি। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র পুষ্টির খরচ পুরো খরচের শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে ৭৫ ভাগ। কথিত আছে, 'ঘাসই মাংস' অর্থৎ ঘাস খেয়ে পশু তার শরীর বৃদ্ধি করে থাকে। আরও কথিত আছে 'গাভীর মুখেই দুধ' অর্থাৎ গাভী যত বেশি পুষ্টিকর খাবার পাবে তত বেশি দুধ দিবে। এককালের বাংলাদেশে কৃষকদের গোয়াল ভরা গরু আজ রুপকথায় পরিণত হয়েছে। গরু থাকলেও তার অবস্থা অস্থিচর্মসার। এর প্রধান কারণ পশুখাদ্যের অপ্রতুলতা। বলতে গেলে বাংলাদেশে কোন সংজ্ঞায়িত চারণভূমি নেই। তবে সবুজ ঘাস বা চারণভূমি কিছুটা আছে বলেই বাংলাদেশের পাবনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম জেলায় কিছু উন্নত জাতের গবাদিপশু পাওয়া যায় (Udo et al. 1992)। অথচ আগে আমাদের দেশে গো-খাদ্যের কোন সমস্যাই ছিল না। তখন পর্যাপ্ত চারণভূমি ছিল। তাই কৃষককে গো-খাদ্যের জন্য কোন চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু কালের বিবর্তনে এসবই রূপকথার মতো হয়ে গেছে।

গবাদিপশুর খাদ্যসামগ্রীকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- আঁশ জাতীয় (roughage) খাদ্য এবং দানাদার (concentrate) খাদ্য। আঁশ জাতীয় খাদ্য খড়বিচালিতে শক্তি ও আমিষ কম এবং তা অনেক ক্ষেত্রে পশুর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব থাকে। তাই খড়বিচালি কোনক্রমেই পশুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেটাতে সক্ষম নয়। অথচ আমাদের দেশে গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হল খুবই নিম্ন খাদ্যমানসম্পন্ন ধানের খড় যা গড়ে দৈনিক সরবরাহকৃত খাদ্যের ৯০%-এরও বেশি হবে। এ সমস্ত উচ্ছিষ্টের খাদ্যমান অত্যন্ত কম বিধায় পশুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মোটেই সমর্থ নয়। বছরের কিছু সময় কিছু সবুজ ঘাস পায় প্রধানত আইল বা রাস্তার পাশে বা পরিত্যাক্ত কোন জমিতে। কাঁচা ঘাসের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষেতে জন্মানো বিভিন্ন জাতীয় ঘাস, রাস্তা বা পতিত জমির আশে-পাশে জন্মানো ঘাস, কচুরি পানা ও বিভিন্ন উদ্ভিদের লতা-পাতা। গবাদিপশুর জন্য স্বতন্ত্রভাবে উন্নতজাতের ঘাসচাষের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে দানাদার খাদ্য শক্তি ও আমিষ সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। ডাল জাতীয় অন্যান্য খাদ্যশস্যের উপজাত এখানে গৌণ। উন্নত দেশের মত এদেশে শস্যকণা পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য জমির অভাব রয়েছে, সেখানে পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি ব্যবহার করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এ ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত খাদ্যের তালিকা, খাদ্যসামগ্রীর সহজ প্রাপ্যতা, বিভিন্ন প্রাণির প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োজনীয়তা অজানা। আমাদের দেশে এখনও পশুর রসদ প্রস্তুতকালে আমেরিকায় উদ্ভাবিত মরিসনের খাদ্যতালিকা সুপারিশ করা হয়। গবাদিপশুর খাদ্যের এ অবস্থার জন্য নানাবিধ কারণ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছে (Huque and Sarker 2014)। এগুলো মোটামুটি সংক্ষেপে হচ্ছে-

- কৃষিজ ফসল উৎপাদনের জন্য চাষযোগ্য জমির প্রায় সবটাই কাজে লাগানো হয়। ফলে গবাদিপশুর মূল খাদ্য যেমন ঘাস উৎপাদন একেবারে সীমিত হয়ে পড়েছে।
- নগরায়নের জন্য নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দালান-কোঠা নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য নানা ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, ইত্যাদির ফলে দারুণভাবে ভূমি-সঙ্কোচন হওয়ায় ঘাস উৎপাদনের কোনই সুযোগ থাকছে না।
- খাদ্যাভাব ক্রমাগতভাবে প্রকট হতে থাকায় গবাদিপশু অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।
- গো-খাদ্য বিশেষত দানাদার খাদ্যের (concentrate) ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও নিম্নমানের হওয়া ও তার পুষ্টিমান আশানুরূপ না হওয়া। গো-সম্পদের স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হবার ফলে এই দুরাবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটছে।

সারণিঃ দেশে সবুজ ঘাসের প্রাক্কলিত বাৎসরিক উৎপাদন।*

জমির ধরন	ঘাস চাষ উপযোগী জমি (হেক্টর)	প্রাক্কলিত সবুজ ঘাস উৎপাদন (২ টন/হেক্টর)
ফসলের ক্ষেতে আগাছা	৩০৯,৩১২	৬১৮,৬২৩
অনাবাদী জমি	৩৮৭,৪৪৯	৭৭৪,৮৯৯
ক্ষেতের আইল	৮০৩,৪৪১	৮০৩,৪৪১
ঘাস চাষ	- - - -	৯৭,৯৭৫
মোট		২,২৯৪,৯৩৯

*ফৌজদার কর্তৃক রচিত ২০১০ সালের নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ জমিতেই ধান ও অন্যান্য কৃষিজ ফসল উৎপাদন করা হয়। এর ফলে অবশিষ্ট যেটুকু জমি থাকে সেখানে গবাদিপশুর জন্য খাদ্য উৎপাদন করার তেমন কোন সুযোগই থাকে না। এছাড়াও বন্যা, খরা ইত্যাদিতো রয়েছেই। স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের উঁচু অঞ্চলে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তাও পর্যাপ্ত নয়। পক্ষান্তরে বন্যাপ্রবণ এলাকায় বর্ষাকালে খাদ্য ঘাটতির ফলে গবাদিপশুর অবস্থার অবনতি ঘটে। প্রতিবছর বাংলাদেশের নদী অববাহিকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকা বর্ষা ও বন্যার পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এ সময় অতি নিম্নমানের খড়ই একমাত্র ভরসা হয়ে থাকে কিন্তু, তাও সংরক্ষণের অভাবে প্রায়শ পচে গিয়ে খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ ও পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বহু গবাদিপশু ডায়রিয়া, কৃমি, বদহজম ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সারণিঃ শস্যের উচ্ছিষ্ট থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের প্রাক্কলন।*

শস্য	উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ (টন)	শস্য-উচ্ছিষ্ট অনুপাত	মোট উৎপাদন
ধান	৩৪.২৬	১ঃ১	৩৪.২৬
গম	১.০৪	১ঃ১.৩	১.৩৫
ভূট্টা	১.৩৭	১ঃ৩	৪.১১
ডাল	০.৩০	১ঃ৪	১.২০
তৈল বীজ	০.২৭	১ঃ২	০.৫০
মোট			৪১.৪৬

*ফৌজদার কর্তৃক রচিত ২০১০ সালের নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

সারণিঃ প্রাক্কলিত খৈল-ভূষি বাৎসরিক উৎপাদন।*

শস্য	উৎপাদন (টন)	উপজাত	নির্যাস হার	উৎপাদিত উপজাতের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)
ধান	৩৪.২৬	কুঁড়া	৬%	২.০২
ধান	৩৪.২৬	খুদ	১%	০.৩৪
গম	১.০৪	ভূষি	২০%	০.২০
ভূট্টা	১.৩৭	শস্য	১০০%	১.৩৭
ডাল	০.৩০	ভূষি	৩০%	০.০৯
তৈলবীজ	০.২৭	খৈল	৭০%	০.১৮
নারিকেল	০.৩৬	খৈল	৭০%	০.২৫
তুলাবীজ	০.০০২	শস্য	১০০%	০.০০২
চিটাগুড়	- - -	- - -	- - -	০.০৭
শুটকি মাছ	- - -	- - -	- - -	০.৩০
সর্বমোট				৪.৮২

*ফৌজদার কর্তৃক রচিত ২০১০ সালের নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

উপরোল্লিখিত সারণিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে মোট ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ গো-সম্পদের (গরু ২.৩৫ কোটি + মহিষ ০.১৪ কোটি + ছাগল ২.৫৪ কোটি + ভেড়া ০.৩২ কোটি) জন্য যে পরিমাণ গো-খাদ্য (সবুজ ঘাস, খৈল-ভূষি ও শস্যের উচ্ছিষ্ট) উৎপাদিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। এর ফলশ্রুতিতে গবাদিপশুকে চাহিদা অনুযায়ী কখনই খাদ্য সরবরাহ করা যায় না। সুষম খাদ্যের গুরুত্বের কথা যতোই ব্যক্ত করা হোক না কেন তা বাস্তবে প্রদান করা সম্ভব হয় না। এর ফলে গবাদিপশুর সার্বিক উৎকর্ষতা অর্জিত হচ্ছে না। এ সমস্ত কারণে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য এর সাথে নানা ধরনের রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবও (প্রধানত ক্ষুরারোগ) গবাদিপশুর সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

উত্তম ও আশানুরূপ উৎপাদন পেতে হলে খাদ্যে অবশ্যই অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের সাথে গ্লুকোজ ও গ্লুকোজেনিক যৌগ এবং প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড থাকতে হবে। আমাদের দেশে খড়বিচালিতে উক্ত পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা একেবারেই কম। তাই সঙ্গত কারণেই দেশের গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা কম এবং তা বংশগত গুণাগুণ যেটুকু বহন করে তাও পুরাপুরি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু উন্নত খাবার ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হলে গবাদিপশুর উৎপাদন অনেক বাড়ানো যাবে এবং সাথে সাথে জাতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

বাংলাদেশে মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসে পশুপুষ্টি সংকট

বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য দ্বিবিধ- (১) যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, (২) ডাল, তৈলবীজ, তরিতরকারি ও প্রাণিজাত খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করে দৈনিক খাদ্যের মান বৃদ্ধি করা। তবে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় বহুবিধ কারণে। খাদ্য উপাদান তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায় হল ভূমির স্বল্পতা। দেশের সকল চাষযোগ্য জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। কৃষি খাতে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে স্বল্পসুদে ঋণদান, সার, বীজ, জলসেচ যন্ত্রের উৎপাদন ও বিতরণের ওপর ভর্তূকি প্রদান ইত্যাদি। বস্তুত সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নানাবিধ কারণে চাষের আওতায় জমির পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসল ঘনত্ব বা নিবিড়তা এবং একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রধানত যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তা হল সার-বীজ-জলসেচ কেন্দ্রিক প্রযুক্তির প্রসার।

প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যেসব কৌশল নেয়ার কথা বলা হয়েছে তা হল ফসল উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পশুখাদ্য উৎপাদন সন্নিবেশিত করা, রোগব্যাধিজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সকল পশুকে রোগ প্রতিরোধ ও রোগ দমন কার্যক্রমের আওতায় আনা। শস্য উৎপাদনের জন্য কার্যক্রমগুলো যতটা বাস্তবায়িত হয়েছে প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম তেমনটা বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্যের প্রধান উৎস হল খড় এবং তার সাথে সামান্য ঘাস। গবাদিপশুর পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান যেমন শস্যের উপজাত কুঁড়া, খৈল, ডালের ভূষি ইত্যাদি অনেক কৃষকের জন্যই দূরূহ। কাজেই পশুপাখির খাদ্যের পুষ্টিমান এমনিতেই খুব খারাপ। তার ওপর খাদ্যশস্য উৎপাদনকেন্দ্রিক নীতি ও কৌশল খাদ্যশস্য বহির্ভূত অন্য ফসলের উৎপাদনকেই শুধু ব্যাহত করেনি, প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনও ব্যাহত করেছে। এ ক্ষেত্রে সম্পদের অপ্রতুলতার চেয়েও বড় কারণ হল প্রাণিজাত দ্রব্য উৎপাদনের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বটিও বাস্তবে উপেক্ষা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য কেন্দ্রিক উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে গবাদিপশুর খাদ্যের পরিমাণ ও মান উভয়ই আরও কমেছে নিম্নলিখিত কারণে-

- সুষম খাদ্যের অভাবে দেশের গবাদিপশু তাদের পুষ্টির জন্য প্রধানত খড়ের উপর নির্ভরশীল। যদিও আমাদের দেশে পতিত জমি চাষ এবং এক ফসলী জমির দোফসলী আবাদের মধ্য দিয়ে দিন দিন ধান উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু সেই অনুপাতে ধানের খড়ের পরিমাণ বাড়ছে না। খড় প্রাপ্তি কমে আসার প্রধান কারণ হল অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ধান চাষের প্রসার লাভ। অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ধান গাছ লম্বায় ছোট হওয়ার কারণে এ থেকে খড় উৎপাদন কম হয়। এ ধরনের খড়ে আবার লিগনিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ বেশি

থাকায় এদের পাচ্যতা (digestibility) অনেক কম।

- খড়ের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় এখন অধিক জমিতে বোরো মৌসুমে ধান চাষ করা হচ্ছে। এই ধান বর্ষার শুরুতে কাটা হয়। ফলে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে খড় পচে যায় এবং তা পশুর গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে জ্বালানীর অভাব দিন দিন প্রকটতর হওয়ার কারণে জ্বালানী হিসেবে খড়ের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে উন্নত জাতের ধান বা গম উৎপাদনের হার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে ঐতিহ্যগতভাবে উৎপন্ন রবিশস্য যেমন ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু ইত্যাদির উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তার অর্থ হল এসব ফসলের উপজাতের উৎপাদন কমেছে। উপরন্তু বিদেশ থেকে ডাল, খাবার তৈল, চিনি আমদানি করে ঘাটতি মেটানো হয় কিন্তু উপজাতগুলো সঙ্গে আসে না বলে গবাদিপশুরা তাদের খাদ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া গম চাষ সম্প্রসারণ অভিযান রবিশস্যের উৎপাদনকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় গবাদিপশু তাদের উপজাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বোবা নির্বিবাদী গবাদিপশুর ভাগ্যে এক কঠিন বিপর্যয় নেমে এসেছে।
- ক্রমাগতভাবে বেশি পরিমাণ ধান, ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু অটোমেটিক মিলে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। ফলে মিল থেকে এসব ফসলের উপজাত যেমন কুঁড়া, খৈল, ভূষি কৃষকদেরকে প্রায়ই কিনে আনতে হয়। অনেক ছোট কৃষকই অর্থের অভাবে সেটা করে না।
- দেশে গবাদিপশু পালনের জন্য আলাদা করে চারণ ভূমি রাখা হয় না। তবে কোন কোন অঞ্চলে কিছু প্রাকৃতিক মৌসুমী চারণভূমি আছে যেমন হাওড়, বাথান, বড় বড় বিল ইত্যাদি। বিশেষত সিলেট, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলায় কিছু নিচু এলাকা আছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে অনেক দূর থেকেও কৃষকরা এসব জায়গায় পশু চরাতে আসে। কিন্তু ভূমি পুনরুদ্ধার, জল নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, হাওড় উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে এসব প্রাকৃতিক চারণভূমির একটা বড় অংশ এখন ধান উৎপাদন এলাকায় রুপান্তরিত হয়েছে।
- উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদনের সাথে সাথে পোকামাকড় দমনের ব্যবহারও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে ধানক্ষেতে উৎপন্ন আগাছাসমূহ গো-খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে এবং গবাদিপশুর স্বাধীনভাবে চড়ে খাওয়ার সুযোগও নিঃশেষ হচ্ছে। তাছাড়া উন্নত জাতের ধান চাষের ভাল ব্যবস্থাপনার ফলে আগাছার বংশ বিস্তারও লোপ পাচ্ছে। তাছাড়া রাস্তা বা জমির আইলের ওপর চড়িয়ে খাওয়ানোর সুযোগও এর ফলে সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

উপরিবর্ণিত সব তথ্য থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে খাদ্যশস্য-কেন্দ্রিক উৎপাদন নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর অর্জিত ফলাফল থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে এই নীতি ও কৌশল অব্যাহত থাকলে তা আত্মঘাতী হতে পারে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে অন্যান্য শস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্যের উৎপাদন আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে দেশে উৎপাদন, বন্টন, খাদ্যগ্রহণ ও পুষ্টিমানে এমন ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে যা বড় রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সাথে অন্যান্য শস্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা বহুগুণ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের সনাতন কৃষিতে শস্য, পশুপাখি ও মাছের উৎপাদনের যে আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বিত রূপ ছিল তা বৈদেশিক সাহায্য ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে যত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তত তাড়াতাড়ি সকল ক্ষেত্রে বিশেষিত উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। দেশের বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও অপ্রতুল সম্পদের অবস্থায় এ রকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে সনাতন কৃষির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে পরোপুরি বিসর্জন দেয়ার সময় বাংলাদেশে এখনও আসেনি বরং কৃষির বিভিন্ন অংশের আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বিত রূপকে ভিত্তি করেই উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনের ওপর জোর দেয়া উচিত। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা দূর করার সময় এখনও আছে এবং তা কাজে লাগানো উচিত।

গবাদিপশুর খাদ্য উৎপদনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পদক্ষেপ

বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্য ঘাটতি প্রকট। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে গবাদিপশুর আঁশ জাতীয় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫০% এবং দানাদার খাদ্য ঘাটতির পরিমান আরও বেশি। অথচ গবাদিপশুর গুণগতমান উন্নয়নের পূর্বশর্ত খাদ্য।

তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস, খড় ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে গবাদিপশুর সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যর্থ হবে। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় এদেশে গবাদিপশু পালন করা হতো মূলত হালচাষ ও পরিবহণ কাজে ব্যবহারের জন্য। বয়ঃবৃদ্ধি অথবা কাজের অযোগ্য হলে মাংসের জন্য অথবা নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে এসব গবাদিপশু বাজারে বিক্রি করা হতো। দুধ ছিল উপজাত খাদ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গবাদিপশু কৃষকের ঘরে সনাতন পদ্ধতিতে পালন করা হতো। এসব পশুর খাদ্য সাধারণত কৃষি উপজাত যেমন ধান ও গমের খড়, চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, তৈলবীজের খৈল, জমিতে জন্মানো আগাছা, ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি। দেশের আবাদি জমির সবটাই ব্যবহার করা হতো কৃষি কাজে। তাছাড়া রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দূরদর্শীতার অভাবে এদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া ও তৈলবীজের খৈল বিদেশে রপ্তানি করা হতো। অধিক জন ঘনত্বের কারণে গৃহায়ন ও অবকাঠামোগত প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমে গবাদিপশুর চারণভূমি সীমিত হয়েছে, এর ফলে সৃষ্ট খাদ্যাভাব দেশে গবাদিপশুর উন্নয়ন এবং আমিষ খাদ্য হিসেবে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেকটাই পূরণ করতে পারেনি।

আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূলত পশুপাখির চিকিৎসা ও রোগ দমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে এবং পশুখাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সংকট নিরসনে বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মূল্যায়ন কালে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে পশুখাদ্যের ঘাটতিকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৮৫ সালে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গবাদিপশু উন্নয়নে ৪ টি মূল লক্ষ্য নির্ধরণ করা হয়।

- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদিত সংকর জাতের গবাদিপশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস উৎপাদন।
- অধিক উৎপাদনশীল পুষ্টিকর ঘাস উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা।
- ঘাস চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রচারনা বৃদ্ধি ও ঘাস চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- দেশের গবাদিপশুর জন্য সরকারি পর্যায়ে খাদ্য কারখানা স্থাপন করে দানাদার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের ২২ টি বৃহত্তর জেলায় পশু খাদ্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সাভার দুগ্ধ ও গবাদিপশুর উন্নয়ন খামারকে কেন্দ্র করে ও রাজশাহী জেলার বাজাবাড়ীহাটে স্থাপিত হয় ঘাস উৎপাদন খামার। প্রতিটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও ২২ টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয় ঘাস উৎপাদন ও ক্যাম্পাস নার্সারি। এছাড়াও প্রতিটি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ঘাসের প্রদর্শনী নার্সারি তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব খামার ও নার্সারি থেকে কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের নেপিয়ার, পারা, গিনি, ভূট্টা, ইপিল ইপিল, কালাই জাতীয় ঘাসের বীজ ও কাটিং সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়। বাড়ীর আঙ্গিনায়, পতিত জমি, রাস্তা ও রেল লাইনের ধার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ, ক্ষেতের আইল এমনকি অন্যান্য ফসলের সাথে এবং দুই ফসলের মধ্যবর্তী কালীন সময়ে ঘাস চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সরকারি গবাদিপশুর খামার সমূহে দানাদার পশুখাদ্য সরবরাহ ও বেসরকারি খামার/কৃষকের নিকট সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিতরণের জন্য ঢাকা জেলার সাভারে পশুখাদ্য করাখানা স্থাপন করা হয়।

আশির দশকের শেষার্ধে গবাদিপশু পালন লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে বিকাশলাভ করতে শুরু করে। ফলে পশুখাদ্যের চাহিদার বাড়তে থাকে। বর্ধিত এ চাহিদার প্রেক্ষিতে কৃষি উপজাত হিসেবে গমের ভূষি, কুঁড়া, তৈলবীজের খৈল, চিটাগুড় ইত্যাদি রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। দানাদার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিশেষ আমদানি সুবিধায় ভূট্টা, গম, সয়াবিন, কনসেনট্রেটেড আমিষ, মিনারেলস, ভিটামিন, এমাইনো এসিড ইত্যাদি আমদানির জন্য বেসরকারি খাতকে সুযোগ দেয়া হয়। একই সাথে সরকারি খামারে দানাদার হাঁস-মুরগির খাদ্য সরবরাহ এবং বেসরকারি খামারিদের নিকট নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় মুরগির খামার মিরপুর, আঞ্চলিক মুরগির খামার পাহাড়তলী চট্টগ্রাম এবং জেলা মুরগির খামার যশোর ও রংপুরে খাদ্য কারখানা স্থাপন করা হয়। তাছাড়া উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে দেশে আরো হাঁস-মুরগির খাদ্য কারখানা স্থাপন করা হয়। ফলে বর্তমানে দেশে পশুখাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খড় ও আঁশ জাতীয় খাদ্যের সংরক্ষণ ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য সমসাময়িক সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বেশ কিছু লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করছে যার মধ্যে ইউরিয়া দ্বারা খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসব খাদ্য দানাদার খাদ্যের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ডাক উইড, এজোলা, এ্যালজি এবং অন্যান্য অপ্রচলিত খাদ্যের ব্যবহার চালুর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

গবাদিপশুর উপাদন বাড়াতে পশুখাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির বিকল্প নাই

বাংলাদেশে গবাদিপশুর উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে চারটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যথা- খাদ্য সমস্যা, দুর্বল স্বাস্থ্য, অনুন্নত জাত ও দুর্বল খামার ব্যবস্থাপনা। অন্যভাবে গবাদিপশু উন্নয়নের অন্তরায়কে আমরা আবার দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা- পরিবেশ ও জাত। পরিবেশের মধ্যে পড়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিবেশগত উচ্চ তাপ পীড়ন (high heat condition) এর এই দেশে গবাদপশুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরিবেশ তথা পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার প্রভাব শতকরা ৮৫-৯৫ ভাগ। আবার পশুর শরীরে যদি পুষ্টির অভাব ঘটে তাহলে এরা যেমন শারীরিকভাবে দুর্বল ও কম উৎপাদনশীল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে তখন চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ফলপ্রসু হয় না। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মত প্রকাশ করেন যে, দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ গবাদিপশু আছে তাদেরকে প্রয়োজনমত খাদ্য সরবরাহ করতে পারলে এদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, রোগব্যাধি কম হবে এবং তখন এদের থেকে মাংস, দুধ ও কর্ষণ শক্তি প্রাপ্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

চিত্রঃ গবাদিপশুর জন্য সরস আঁশ এবং দানাদার খাদ্য।

পশুপাখির মাংস উন্নতমানের আমিষ। আমিষের অভাবে মানসিক ও দৈহিক বৃদ্ধির (বিশেষ করে শিশুদের) সাংঘাতিক ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের গড় উচ্চতা পূর্বের তুলনায় কমে গেছে। আমাদের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের অভাবই সম্ভবত এর মূল কারণ। আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে গবাদিপশুর অবদানকে খাটো করে দেখলে চলবে না। গবাদিপশু আমাদের আর্থসামাজিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের যুব সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ২০ ভাগ) এর সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থান প্রাণিসম্পদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে দুঃস্থ মহিলা ও গরীব কৃষক সম্প্রদায় ছাগল-ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কিছু উপার্জনের মুখ দেখে। হিসাব মতে প্রায় ৫০ ভাগ জনগণের খন্ডকালীন কর্মসংস্থান প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও গবাদিপশুর গোবর ফসলের ক্ষেতে সার এবং রান্নার কাজে জ্বলানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে ফসলের জমি চাষাবাদের জন্য এখনো উল্লেখযোগ্য শক্তি আসে পশুশক্তি থেকে। অতএব দেখা যাচ্ছে গবাদিপশুর অভাবে বাংলার ক্ষেতে খামারে লাঙ্গল অচল হয়ে পড়বে। ফলে ক্ষেতে ফসল ফলবে না এবং বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাতের অভাব

দেখা দেবে। এ ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, ৭০ দশকে যেখানে একটি গরু থেকে প্রায় ০.২৫ অশ্ব শক্তি পাওয়া যেত বর্তমানে দেশের গবাদিপশু পুষ্টি অভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি গরু থেকে মাত্র ০.১৭ অশ্ব শক্তি পাওয়া যায়। ফলে দেশে বর্তমানে কর্ষণ শক্তি ঘাটতি প্রায় শতকরা ৪১ ভাগ। দেশে রাসায়নিক সারের চাহিদার প্রায় ২০ ভাগ আসে গোবর থেকে। গবাদিপশুর চামড়া রপ্তানি করে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সম্পদের উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল সেই সম্পদের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অনেকে অবশ্য মত প্রকাশ করেন যে আমাদের দেশের গবাদিপশু জাতগত দিক থেকে কম উৎপাদনশীল। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের গবাদিপশুর ঘনত্ব বেশি থাকা সত্বেও (বাংলাদেশে ১৪৫/বর্গ কিলোমিটার যেখানে ভারত ও ব্রাজিলে যথাক্রমে ৯০ ও ৫০/বর্গ কিলোমিটার) এদের উৎপাদন কম। তাদের এ ধারণা একবারে অযৌক্তিক নয়। তবে একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের দেশের গবাদিপশু নিম্নমানের খাবার, প্রয়োজনের তুলনায় অল্প পরিমাণে খেয়ে, প্রতিকূল পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও বেঁচে আছে এবং আমরা এই সম্পদ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। যুগ যুগ ধরে ব্যাপারটা চলার জন্য দেশের গবাদিপশু নিম্নমানের খাবার খেয়ে কর্মক্ষম থাকার এবং স্থানীয় রোগব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অপরপক্ষে বিদেশী অধিক উৎপাদনশীল পশুর জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার সরবরাহ ও উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। তাছাড়া এদের দিয়ে লাঙ্গল অথবা গাড়ী টানার কাজ করা সম্ভব নয় এবং এরা স্থানীয় রোগ ব্যাধির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ খামারির ঘরে বিদেশি গরুর উৎপাদন ব্যহত হতে বাধ্য। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত খামার, যেমন দুগ্ধ খামার, মাংস উৎপাদন খামার ইত্যাদি যেখানে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ সাধারণ ব্যবস্থাপনা উন্নতমানের রাখা সম্ভব সেখানে উন্নত জাতের গবাদিপশু থেকে ভাল ফল আশা করা যায়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপশু আমদানির মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারণাটি কার্যকর করার চেয়ে দেশী গবাদিপশুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করে একটি দেশীয় উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো বিশেষ প্রয়োজন। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে দেশি গবাদিপশু উন্নত জাতের বিদেশি গবাদিপশু দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদন বাড়ানোর ধারণার চেয়ে সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতিতে স্থানীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য। বিশেষজ্ঞ মত এটাও যে দেশে বর্তমানে যে গবাদিপশু রয়েছে তাদেরকে উন্নত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা উপহার দেওয়ার মাধ্যমে এদের থেকেই আমরা পায় দ্বিগুণ উৎপাদন পেতে পারি।

গবাদিপশুর খাদ্য সংকট নিরসনে বাস্তবমুখী পদক্ষেপসমূহ

গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশুখাদ্যের সরবরাহ বা প্রাপ্যতা বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। পশুখাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার জন্য প্রয়োজন জমির। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদন তথা শস্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি করতে হচ্ছে, এবং সঙ্গত কারণেই পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য পৃথক জমি বরাদ্দের বিষয়টি ক্রমে আরো গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের গবাদিপশু থেকে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য বিকল্প উপায়ে পশুখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। দেশে আঁশ জাতীয় খাদ্যের অভাব প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ এবং দানাদার খাদ্যের অভাব প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ। অর্থাৎ দেশে পশুখাদ্যে পুষ্টির অভাব গুরুতর; এদের মধ্যে শক্তি (energy) ও আমিষের (protein) অভাব আশঙ্কাজনকভাবে অধিক। তবে কৃষি ও শিল্পের উপজাত দ্রব্যসামগ্রীর যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে পশুখাদ্যে শক্তির ঘাটতি অনেকাংশ পূরণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া অপ্রচলিত আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য সঠিকভাবে ব্যবহার করে আমিষের বিরাট ঘাটতি বহুলাংশে মেটানো সম্ভব। এখন কি উপায়ে খামার উপজাত বা শিল্প উপজাত দ্রব্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে ও যথাযথভাবে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

আঁশ জাতীয় খাদ্যের মানোন্নয়ন: গো-খাদ্যের মোট শুষ্ক পদার্থের শতকরা ১০ ভাগ পাওয়া যায় খড়বিচালি জাতীয়

সামগ্রী থেকে। এ জাতীয় খাদ্যসামগ্রী বিভিন্ন পুষ্টির মধ্যে সাধারণত শক্তির উৎস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এ সব খাদ্যসামগ্রী স্বভাবতই অতি নিম্নমানের হয়ে থাকে। তাই আমাদের দেশের গো-সম্পদের পুষ্টি সমস্যার সমাধানকল্পে সর্বাগ্রে খড়বিচালি জাতীয় খাদ্যসামগ্রীর মান উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিভিন্ন উপায়ে নিম্নমানের আঁশ জাতীয় খাদ্যের মানোন্নয়ন করা যায়। দেশে বিদেশে এর ওপর অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সফলতাও লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- খড় একটি নিম্ন পুষ্টিমান সম্পন্ন পশুখাদ্য তবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা যায়। তন্মধ্যে- ক) ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় ও খ) ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া খনিজ লবণ, ডাল জাতীয় ঘাস, খৈল, শুটকি মাছের গুড়া, এজোলা, কচুরিপানা ইত্যাদি এক বা একের অধিক খড় বা বিচালি জাতীয় খাদ্যের সাথে বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রিত অবস্থায় খাওয়ালে নিম্নমানের খড়বিচালির খাদ্যমান ও পাচ্যতা অনেক গুণে বেড়ে যায়।

চিত্রঃ গবাদিপশুর আঁশ জাতীয় খাদ্যের মানোন্নয়ন এবং অপ্রচলিত খাদ্যের উৎস।

অপ্রচলিত উৎসের খাদ্য ব্যবহার করা: দেশে বিদ্যমান অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সঠিক ও পূর্ণ ব্যবহার করে পশুখাদ্যের লভ্যতা বাড়ানো যায়। যেমন খামার বা কৃষি শিল্পের অনেক উপজাত আছে যা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় যদিও তা বর্তমানে তেমন খুব একটা হচ্ছে না। বরং অনেক ক্ষেত্র এসব উপজাত দ্রব্যের অপসারণ কষ্ট সাধ্য এবং পরিবেশকে দূষিত করে থাকে। যেমন- গরুর রোমন্থন থলির বস্তু, কসাইখানার রক্ত, হাড়, রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট, ফলের শাস ও উচ্ছিষ্ট, রেশম শিল্পের উপজাত দ্রব্য, গুটি পোকার পিউপা, চা বাগানের উচ্ছিষ্ট, চিংড়ির উচ্ছিষ্ট, রাবার বীজ, শাল গাছের বীজ, কতকগুলো গাছের পাতা, কচুরিপানা, মিষ্টি আলুর পাতা, পাট পাতা, এ্যালজি, এজোলা, সুতিপানা, কচুরিপানা ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পশুখাদ্য উৎপাদনে অপ্রচলিত ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি: ঘাস অথবা ফডার উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত জমির অভাবে যেখানে যতটুকু জমি পাওয়া যায় সেটুকুই পশুখাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন- রাস্তার ধারে, বাঁধের ধারে, পতিত জমিতে, পাহাড়ী এলাকায়, চা বাগন, ফলের এবং সবজি বাগানে উপযুক্ত ফডার জাতীয় গাছ লাগানো; ঘরের আনাচে-কানাচে পতিত জায়গায় এমন গাছ লাগানো যার কাঠ রান্না বান্না ও পাতা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত এলাকায় উপযুক্ত ঘাস চাষের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পশুখাদ্য উৎপদনে কৃষি জমির বহুল ব্যবহার: কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের সাথে সাথে গবাদিপশুর ঘাস উৎপাদনের উপযুক্ত কর্মসূচি হাতে নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন শস্যের ক্ষেতে সাথী ফসল হিসেবে গো-খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়। ভূট্টা জাতীয় দ্বিমুখী জাতীয় ফসলের চাষ বাড়ানোও একটি ভাল পদ্ধতি। কারণ ভূট্টা যেমন মানুষ খেতে পারে তেমনি পশুপাখিও খেতে

পারে। এছাড়া ভূট্টার গাছ ফডার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা ফসল ওঠার পর তা চমৎকার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন চাষাবাদ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের গো-খাদ্যের জাত বা প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, পুষ্টিমান ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রণয়ন জরুরি।

বনভূমির ব্যবহার: আমাদের দেশে যে বনভূমি রয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করেও গো-খাদ্যের কিছুটা চাহিদা মেটানো সম্ভব। এসব বনভূমিতে যেসব গাছ রয়েছে তাদের ফাঁকে ফাঁকে গো-খাদ্যের চাষ করা একটা সুন্দর পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশ এ পদ্ধতিতে ঘাস উৎপাদন করে আসছে। বৃক্ষরাজির সাথে ইন্টারক্রপ বা আন্তঃফসল হিসেবে ঘাস উৎপাদন করে অনেকে লাভবান হয়েছেন। যেমন, নারিকেল গছের ফাঁকে ঘাস উপাদন, পাম বাগানে ঘাস চাষ এবং রাবার বাগানে ঘাস চাষ। এসব জায়গায় গো-চারণ করে আশানুরূপ ফললাভ হয়েছে। গবেষকগণ আগাছা বৃদ্ধি রোধ, মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে বেশ ভাল ফল পেয়েছেন। আমাদের দেশেও এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা পশুখাদ্যের ঘাটতি কিছুটা কমানো সম্ভব হবে।

হাওড়-বাওর ব্যবহার: বাংলাদেশের হাওড়-বাওরে নানা রকম ঘাস জন্মায়। এসব এলাকায় বর্ষাকালে সাধারণত অন্য কোন অর্থকরী ফসল হয় না। এসব জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের চাষ করে খুব ভাল ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব উৎপাদিত ঘাস সঠিক প্রক্রিয়াজত ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ঘাসের অপ্রতুলতা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। এ ছাড়া আধুনিক কৌলি ও প্রজনন বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে এ সমস্ত হাওর ও বিলে উপযুক্ত ঘাসের চাষ করা যেতে পারে।

পশুখাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া: বাংলাদেশে সার্বিকভাবে পশুখাদ্যের অভাব থাকলেও বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন পশুখাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত পশুখাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে খাদ্যাভাবের সময় অথবা খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে সেগুলি ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- ক) বর্ষা মৌসুমে ভিজা ও তাজা খড় সংরক্ষণ, খ) সবুজ ঘাস সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রাপ্ত খাদ্যের পুষ্টি ভিত্তিক সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা: বাংলাদেশের কৃষক এবং সধারণ খামারিদের পশুপুষ্টি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে তাদের পক্ষে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রীর সমন্বয়ে সুষম পশুখাদ্য তৈরি করা সম্ভব হয় না। ফলে দেখা যায় যে, অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রী কৃষক তার গবাদিপশুকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাওয়ায় এবং খাদ্য সামগ্রীর এ ধরনের অদক্ষ ব্যবহারের জন্য পশুখাদ্যের প্রচুর অপচয় হয়। এই অপচয় রোধে প্রয়োজন অঞ্চল ও ঋতু ভিত্তিক খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তির তালিকা প্রণয়ন করা এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ঋতুভিত্তিক সুষম অথচ সস্তা খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে তা কৃষকদের দোরগোঁড়ায় পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়া।

দুষ্প্রাপ্য পশুখাদ্যের অপব্যবহার রোধ করা: উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- গ্রামাঞ্চলে জ্বালানির অভাবের সময় ধানের খড় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার কারা হয়। প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবেও এই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পশুখাদ্যের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। খড় ও অন্যান্য পশুখাদ্যের এ ধরনের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা: অনেক খাদ্য উপকরণ দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে সেগুলি অপচয় হচ্ছে এবং উৎপাদন এলাকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত খামারিকে একই খাদ্য উপকরণ অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- চিনিকলগুলিতে প্রতি কেজি মোলাসেসের মূল্য মাত্র ১ টাকা। একই মোলাসেস দূরত্বভেদে খামারিদের ক্রয় করতে হয় ৪ টাকা থেকে ১২ টাকা দরে। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে মোলাসেস ও স্টিলেজের পশুখাদ্য হিসেবে চহিদা থাকা সত্ত্বেও এগুলি অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে এবং মিল কর্তৃপক্ষ সেগুলি ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া: দেশে পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। কৃষি, বন ও বিভিন্ন শস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিক ফলনের উপর গবেষণা চালানোর সময় পশুখাদ্যের দিকটি বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের পশুর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের সহজ উপায় বের করার জন্য অন্যতম পন্থা হিসেবে খাদ্য খাওয়ার পদ্ধতির ওপর বিশেষভাবে গবেষণা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে গো-খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, খাদ্যের নিম্ন গুণাগুণ সম্পন্নতা এবং আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের দেশীয় সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিসমূহকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য দেশের সমস্ত স্তরের খামারি ভাইদেরকে খাদ্য সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে (NGO) এ বিষয়ে এক যোগে কাজ করতে হবে। আমাদের কৃষকভাইদেরকে এ সকল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিসমূহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এ বিষয়ে তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। গো-খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সীমিত চাষযোগ্য জমি এবং উৎপাদিত পশুখাদ্যের পরিমাণ যেহেতু চাহিদার তুলনায় অনেক কম সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প এবং অপ্রচলিত খাদ্যের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গো-খাদ্য বিশেষ করে কাঁচা ও ভেজা ঘাস, ভূট্টার কান্ড, ভেজা ও শুকনো খড়, আখের উপজাত, কলাগাছ ও কচুরিপানা সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া দরকার। এ সমস্ত পশুখাদ্য যদি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন গো-খাদ্যের পচনরোধ করা যায় তেমনি অপর পক্ষে খাদ্যের ঘাটতি বহুলাংশে মেটানো সম্ভব। শুধু তাই নয় বরং দীর্ঘস্থায়ী পশুখাদ্যের ঘাটতি পূরণ করে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা অবশ্যই বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আলোচিত ব্যবস্থাগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হলে আপৎকালীন পর্যাপ্ত গো-খাদ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী দুধ ও মাংস উৎপাদনের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে দেশ অনেকটা এগিয়ে যাবে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উল্লেখ্য, এ সকল ব্যবস্থাদি পরিবেশবান্ধব এবং খামারিকে দুর্যোগের সময় উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত রেখে গবাদিপশু পালন ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন রেখে দুধ ও মাংস উৎপাদনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে পশুখাদ্যের পরিমাণ ও মানগত চাহিদার চেয়ে প্রাপ্যতা যদিও বহুলাংশে কম তথাপি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় বা পন্থা অবলম্বন করে এ বিশাল ঘাটতির অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। আলোচ্য বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সম্যক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজন দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করানো। তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সম্প্রসারণ কর্মসূচি হতে নেওয়া। পরিশেষে বলা যায়, আমরা যদি পশুখাদ্যের এই সঙ্কট সম্পর্কে সচেতন হই, পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক হই এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাই তাহলে এ সঙ্কট কাটিয়ে উঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। পশুখাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, নিম্নমানের পশুখাদ্য, নিম্নহারে খাদ্য গ্রহণ, পাচ্যতার নিম্নহার, বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাব, আমিষ বা শক্তি উৎসের তথা খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি এসব কিছুর মধ্যেই গবাদিপশুর উন্নতিকল্পে পশুপুষ্টি বিজ্ঞানীদের সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠ - ৪
বাংলাদেশ জৈব প্রাণিসম্পদের পরিপ্রেক্ষিত

প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে কোন একটি বিশেষ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। খামারের অবস্থান এবং নির্মাণ শৈলী, সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পশুপাখির বয়স, জেনেটিকস, বায়োসিকিউরিটি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলাফলের উপর একটি খামারের সার্বিক উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কিন্তু প্রায়শঃ যেটা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে খামারে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধির বিরাজমানতা। সংক্রমণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে খামারের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে খামারের ব্যাপক ক্ষতির প্রভাব দেশের অর্থনীতির উপর পড়ে। খামারের এ ব্যর্থতার জন্য এ শিল্পের প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হতাশা সৃষ্টি হয়। এসব নানা কারণে এ শিল্পের উন্নয়ন আশানুরূপ হচ্ছে না। সাম্প্রতিককালে যে বিষয়টি সবচেয়ে আলোচনা ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে তা হচ্ছে পশুপাখির খাদ্যে গ্রোথ প্রোমোটার হিসেবে এন্টিবায়োটিকস্-এর যথেচ্ছ ব্যবহার এবং মানুষের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

মানুষের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা এবং পশুপাখি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকস্ এর ব্যবহার অতীব প্রয়োজনীয় সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এন্টিবায়োটিক গ্রোথ প্রোমাটার (এজিপি) দীর্ঘদিন যাবৎ ক্রমাগতভাবে খামারিগণ কর্তৃক পশুপাখির খাদ্যের সাথে ব্যবহৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে অনুজীব কর্তৃক এন্টিবায়োটিকস্ এর প্রতি প্রতিরোধী হয়। এ ধরনের প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের ফলে মানব দেহে এন্টিবায়োটিকস্ এর প্রতি প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা অনেক সময় মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। বিশেষ করে জীবন রক্ষাকারী ঔষধের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতা যথেষ্ট উদ্বেগ ও শংকার কারণ হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কয়েক বছর আগে থেকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য পালিত পশুপাখিতে দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য এন্টিবায়োটিকস্ এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য এ ব্যবস্থার ফলে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বাড়বে সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু খামারে রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুসারিত হতে হবে। এজন্য খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য বহির্ভূত কারিগরি ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রভূত উন্নতি সাধন করতে হবে। অন্যথায় খামারি ভাইদের যেমন আর্থিক অপচয় হবে তেমনি খামারের উৎকর্ষতাও আশানুরূপ হবে না।

চিত্রঃ পরিবেশের ওপর পশুপাখির চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের প্রভাব।

বিজ্ঞানীদের মতামত হচ্ছে, জীব নিরাপত্তা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা কঠোর করতে হবে এবং এর সাথে ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচী, all-in all-out পদ্ধতি, বিভিন্ন বয়সী মুরগি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিপালন, ভ্যাকসিন প্রদান মনিটরিং, সুষম খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পন্থায় গৃহীত হতে হবে। এজিপি এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও এর বিকল্প খাদ্য উপাদান যে অনুরুপ ফল প্রদান করে তা ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিওসেজেস, ব্যাকটেরিওসিনস, বিটেইন, বোটানিক্যাল ও হার্বস্, কপার, প্রিবায়োটিকস্, প্রোবায়োটিকস্ ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টিকারী

ব্যকটেরিয়া, জীবন্ত ঈষ্ট, সংমিশ্রিত ব্যাকটেরিয়াল কালচার, এসেনসিয়াল অয়েলস ও স্পাইস-এর নির্যাস, এনজাইমস্, ম্যানেন অলিগোস্যাকারাইডস্ (MOS), ফ্রুকটো অলিগোস্যাকারাইডস্ (FOS), জৈব এসিডস, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এ্যান্টিবাডির ব্যবহার প্রভৃতি। এগুলোর উপর বিজ্ঞানীরা গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। তাই আশা করা যায় আগামীতে বিশ্ববাসী এন্টিবায়োটিকস্ মুক্ত প্রাণীজ আমিষ নির্ভাবনায় গ্রহণ করা যাবে। এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকেও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ার ব্রত নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের প্রাণীজ আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এসবের বিভিন্ন প্রোডাক্ট) বিদেশের বাজারে লোভনীয় সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ঔষধের ব্যবহার ও এর গুরুত্ব

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সার্বিক উৎকর্ষতা অর্জনের মূলে সুস্বাস্থ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রোগ প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। রোগ প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন প্রদানের বিষয়াদি প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম রোগ দমনের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। সুতরাং তা নিপুণভাবে পরিচালিত করতে হবে। তা না হলে কাঙ্খিত ফল লাভ করা যাবে না। এজন্য এ উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা উচিত তা হচ্ছে।

- সঠিক ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচী প্রণয়ন।
- কার্যকর ভ্যাকসিন নির্বাচন।
- ভ্যাকসিন ও ডাইলুয়েন্ট সঠিকভাবে সংরক্ষণ।
- ভ্যাকসিন প্রদানকার্যে ব্যবহার্য সকল সরঞ্জামাদির সঠিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ।
- সঠিক পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন ডাইলুশন।
- অভিজ্ঞ ভ্যাকসিনেটর দ্বারা ভ্যাকসিন প্রদান।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রদান কার্য সম্পন্ন।
- ভ্যাকসিন ডাইলুশনের জন্য ব্যবহৃত পানির সঠিক গুণগতমান।
- ধকল প্রতিরোধ।
- ভ্যাকসিন প্রদানান্তে সকল সরঞ্জামাদির জীবাণুনাশকরণ।
- সেরলজী সম্পাদনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন কর্মসূচি মনিটরিং।
- কর্মসূচী অনুযায়ী সঠিক সময়ে পুনঃভ্যাকসিন প্রদান।
- ভ্যাকসিন প্রদান সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ।

রোগদমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষেত্র, অবস্থা বা পরিবেশ অনুযায়ী ঔষধ প্রদান অত্যন্ত আবশ্যকীয়। সংক্রামক রোগ দমনের জন্য অবশ্য ঔষধ প্রদান করা ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে তা সর্বাগ্রে পালন করতে হবে। এছাড়া আরো যেসব রোগ আছে সেগুলো প্রতিরোধের জন্য বর্তমানের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিপালিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামারে নানা জাতীয় ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঔষধের শ্রেণীসমূহ হচ্ছেঃ

- কৃষিনাশক (anthelmintics)
- প্রোটোজোয়া প্রতিরোধী ঔষধ (anticoccidials)
- এন্টিবায়োটিকস্ (antibiotics)
- সালফোনামাইড গ্রুপ (sulphonamide group)
- এন্টিভাইরাল ড্রাগস (antiviral drugs)
- মাইকোটক্সিন প্রতিরোধী ঔষধ (antitoxins)
- এন্টিফাংগাল ড্রাগস (antifungal drugs)
- হরমোনস্ (hormones)
- স্টেরইডস্ (steroids)

- নন-স্টেরইডাল এন্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগস (NSAID)
- বিপাকীয় ঔষধ (metabolic preparations)
- কোমোথেরাপিউটিকস (chemotherapeutics)
- বহিঃ পরজীবীনাশক (ectoparasiticides)
- মিনারেলস্ (minerals)
- ভিটামিনস্ (vitamins)
- ক্ষুধাবর্ধক ঔষধ (digestive stimulants)
- লিভার টনিক (liver tonic)
- চেতনাশক ঔষধ (anaesthetics)
- মূত্রবর্ধক ঔষধ (diuretics)
- এন্টিসেপ্টিকস্ এ্যান্ড ডিজইনফেকট্যান্টস্ (antiseptics & disifectants)

উল্লিখিত ঔষধগুলো পশুপাখিতে ব্যবহারের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন ফর্মে (form) পাওয়া যায়। যেমন- তরল, ট্যাবলেট, পাউডার, ক্যাপসুল, ইমালশন, এ্যান্টেরিক কোটেড ট্যাবলেট, অয়েনমেন্ট, সাসপেনশন, ইনজেকশন, পোর-অন, ইমপ্লান্টস ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রেণীর ঔষধ ছাড়াও আরো কিছু ঔষধ আছে যেগুলো শক্তি, পুষ্টি বা দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একটি কথা স্মরণ রাখা বিশেষ জরুরি যে প্রতিটি ঔষধ প্রয়োগের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ও সময়কাল রয়েছে। যদি সঠিক মাত্রা এবং ব্যবহারের পূর্ণ সময়কাল মানা না হয় তাহলে কোন সময়ই কাঙ্খিত ফল লাভ করা যায় না। তাছাড়া হ্রাসকৃত মাত্রা ও প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ সময়কাল সংক্ষিপ্ত হলেও রোগের উপশম হবে না এবং সংশ্লিষ্ট রোগজীবাণু এসব ঔষধের প্রতি প্রতিরেধী (resistant) হয়ে যায়। এবিষয়ে অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।

ঘন ঘন এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহারের ফলে মানুষ ও পশুপাখিতে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। যদি পশুপাখি প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বহন করে তাহলে তাদের থেকে উৎপাদিত খাদ্যেও এসব ব্যাকটেরিয়া থাকবে। এসব খাদ্য মানুষ গ্রহণ করলে তাদের দেহেও প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া হবে এবং তা থেকে যে কোন সময় সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। যেসব এ্যান্টিবাযোটিকস্ মানুষের প্রাণঘাতি রোগের চিকিৎসার জন্য 'সর্বশেষ' ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজন, সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির ঘটনা রয়েছে। খাদ্য উৎপাদনকারী পশুপাখিতে এসব 'সর্বশেষ' এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহার করার পর সর্বদিক হতে প্রতিরোধী (multiresistant) ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি ও বিস্তার ঘটতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে ciprofloxacin প্রতিরোধী সালমোনেলা স্পিসিসের স্ট্রেইনস্, Campylobacter স্পিসিস এবং E-coli, vancomycin প্রতিরোধী entero-coccus এর স্ট্রেইনস্ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যবটেরিয়ার প্রতি third generation cephalosporin প্রতিরোধ।

যে কোন প্রকারের এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহৃত হোক না কেন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তি জন্মাতে পারে। মোট কী পরিমাণ এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর প্রতিরোধের মাত্রা নির্ভর করে। প্রোথ প্রোমোটার হিসেবে এন্টিবায়োটিকস্ এর ব্যবহারের ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ও ফিড এপিসিয়েন্সির উন্নতির বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দৈহিক বৃদ্ধিকল্পে এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহার করা উচিত নয়। এগুলো কেবলমাত্র রোগ নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা উচিত। মানুষের অনেক মারাত্মক ধরনের সংক্রমণ আছে যেখানে গুটিকয়েক এন্টিবায়োটিকস্ কার্যকর হয়। কিন্তু যদি এসব ঔষধের প্রতি সংক্রামক এজেন্টসমূহ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পরিবর্তিত কোনো এন্টিবায়োটিকস্ থাকবে না। সুতরাং এসব ঔষধকে 'সর্বশেষ' ব্যবস্থা হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। এসব এন্টিবায়োটিকস্-এর পরিবর্তে যেগুলো পাওয়া যায় তা দিয়ে অসুস্থ পশুপাখিকে চিকিৎসার করে সুস্থ করে তোলা যায় (উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি)। যেসব এন্টিবায়োটিকস্কে 'অতীব জরুরি' এবং 'সর্বশেষ চিকিৎসা' বা 'রিজার্ভ' হিসেবে অভিহিত করা হয় সেগুলো হচ্ছেঃ

এন্টিবায়োটিকের শ্রেণী	উদাহরণ (মূখ্যত মানুষের কিন্তু পশুপাখিতেও ব্যবহৃত হয়)
Glycopeptides	Vancomycin, Teicoplanin, Avoparcin
3rd and 4th generation Cephalosporins	Cefotaxime, Cefitriaxone, Ceftiofur, Cefipime
Anti-pseudomonal penicillins	Piperacillin, Ticarcillin
Anti-tuberculosis drugs	Rifampicin, Isoniazid, Ethambutol, Pyrazinamide
Fluoroquinolones	Ciprofloxacin, Levofloxacin, Enrofloxacin
Aminoglycosides	Amikacin
Carbapenems	Imipenem, Meropenem
Stretogramins	Synercid Virgininamycin
Oxazidolones	Linezolid

*only those with a relative extended spectrum and/or a much lower susceptibility to enzymatic destruction e.g. Amikacin

কৃষি শিল্পে এন্টিবায়োটিকস্ এর ব্যবহার সম্পর্কিত তিনটি মূলনীতি অনুসারিত হলে এন্টিবায়োটিকস্ এর প্রতি অহেতুক প্রতিরোধী ক্ষমতা সৃষ্টি করার মূল ফ্যাক্টরগুলো বহুলাংশে হ্রাস বা বিদূরিত করা যাবে। অসুস্থ পশুপাখির চিকিৎসার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অথবা লাভজনকভাবে খাদ্য হিসেবে পশুপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আলোচ্য নীতিগুলি হচ্ছেঃ

- মানুষের মারাত্মক সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার্য 'সর্বশেষ' ধরনের এন্টিবায়োটিকস্ মানুষের খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতিপালিত পশুপাখি বা কৃষিতে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- পশুপাখির রোগ প্রতিরোধকল্পে এন্টিবায়োটিকস্-এর ব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে রাখতে হবে। সংক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতি (এন্টিবায়োটিকস্ ব্যতীত) উন্নয়ন ও বিস্তৃত করতে হবে।
- গ্রোথ প্রোমোটার হিসেবে এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহার পর্যায়ক্রমে পরিত্যাগ করতে হবে।

আর একটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে, এন্টিবায়োটিকস্ প্রয়োগের পূর্বে সংবেদনশীলতা পরীক্ষা (sensitivity test)। এ ধরনের পরীক্ষার পর যদি সঠিক এন্টিবায়োটিকস্ প্রদান করা যায় তাহলে এর অপপ্রয়োগ যেমন বন্ধ হবে তেমনি চিকিৎসা কার্যক্রম কার্যকর হবে।

অনেক ধরনের ঔষধই পশুপাখিতে ব্যবহারের পর তা দেহের মাঝে সঞ্চিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর তা দেহ হতে বিদূরিত হয়। এই নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পশুপাখির মাংস/দুধ ডিম মানুষের গ্রহণ করা উচিত নয় এবং এজন্য এসমস্ত খাদ্য সামগ্রী বাজারজাত করাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ঔষধের অবশিষ্টাংশ যা খাদ্য সামগ্রীতে থাকে তা মানুষ গ্রহণ করলে মানবদেহে এসবের অনুপ্রবেশ ঘটবে। এর ফলশ্রুতিতে রোগজীবাণু প্রতিরোধী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। রোগব্যাধি দমনের জন্য ভ্যাকসিন ও ঔষধের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি খামার জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুনাশক প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ ব্যবস্থা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় যদি ঐ সংশ্লিষ্ট এলাকাতে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। খামারে কার্যকর জীবাণুনাশক সঠিক নিয়মানুযায়ী নিয়মিত ব্যবহার করলে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ বহুলাংশে হ্রাস পায়। অবশ্য এর সাথে কঠোর বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাও চালু রাখতে হবে। জীবাণুনাশকের বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং এর বিষাক্ততাও রয়েছে। সুতরাং এর কার্যকর ব্যবহার ও পরিবেশের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই একজন ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ ও সহায়তা নেয়া উচিত। পরিশেষে বলা যায় যে পশুপাখির উন্নয়নের জন্য ঔষধ ও ভ্যাকসিনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসবের ব্যবহার সবসময় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাবলীর ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুর উপরই প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করছে।

পোল্ট্রি উৎপাদনে অর্গানিক ফিডের ব্যবহার

বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের সম্ভাবনা অপরিসীম। অন্যান্য প্রাণীজ আমিষের চেয়ে সহজলভ্য ও দাম কম হওয়ায় মানুষের পছন্দের জায়গায় মুরগীর ডিম ও মাংস স্থান পেয়েছে। আর ডিম ও মাংস উৎপাদনে দেশের পোল্ট্রি শিল্প বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে পোল্ট্রি উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণহীন এন্টিবায়েটিকের ব্যবহার আগামীতে পোল্ট্রি শিল্পকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। আগামী দিনের পোল্ট্রি শিল্পকে ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য কিভাবে মুরগীর খাদ্যে তেমন ঔষধ ব্যবহার না করেই মুরগী পালন লাভজনক করা যায়, সেটি এখন আলোচনার বিষয়। বাংলাদেশের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য পোল্ট্রি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নববই দশক থেকে দেশব্যাপী পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এর পিছনে মূল ভূমিকা পালন করছে প্রাইভেট সেক্টর। বিভিন্ন রোগবালাই এ শিল্পের অন্যতম হুমকি। আবার এ শিল্পের কাচামাল হিসেবে ফিড তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ হরমোন, এনজাইম এবং এন্টিবায়োটিকের মিশ্রণ প্রয়োগ করার খবর বিভিন্ন সময় মিডিয়ায় এসেছে। এই ফিড খাওয়ানোর ফলে মুরগি সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকছে। খামারিরা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ভোক্তাদের উপর এর বিরুপ প্রভাব পড়ার ঝুঁকি রয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে দেশে এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধমুক্ত ব্রয়লার মুরগীর মাংস জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই ভোক্তাদের বিষয় মাথায় রেখে পোল্ট্রি উৎপাদনে অর্গানিক ফিডের ব্যবহার নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সুইডেনসহ ইউরোপীয় পোল্ট্রি ফিডে এন্টিবায়োটিক সহ বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ হরমোন এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন সুইডেনে এন্টিবায়োটিক মুক্ত অর্গানিক পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন হচ্ছে। এটাকে পোল্ট্রি ফিড শিল্পের সুইডিশ মডেল বলা হয়ে থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় সাম্প্রতিক সময়ে এন্টিবায়োটিক মুক্ত পোল্ট্রি উৎপাদনে ব্যপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সময় এসেছে পোল্ট্রি শিল্পের বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ প্রোমোটার নিষিদ্ধ করতে হবে। তা না হলে এর দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

চিত্রঃ পোল্ট্রিতে অর্গানিক ফিডের ব্যবহারই কাম্য।

পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের অপরিহার্যতার জন্য খাদ্যের মান অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। একটি পোল্ট্রি খামারের ব্যয়ের ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ খরচ হয় পোল্ট্রির খাবারের পিছনে। কাজেই খাবারের মান যদি যথোপযুক্ত না হয় তা হলে সে খামারে লাভের আশা বৃথা। বংশগতভাবে একেক জাতের মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা একক রকম। মুরগির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে হলে প্রথম যে শর্তটি পূরণ করতে হবে তা হল তাকে উন্নত ও সুষম খাবারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতঅর্থে মুরগি একটি মেশিনের মত। যার কাজ হল খাবার নামক কাঁচামাল থেকে ডিম বা মাংস নামক পণ্য তৈরি করা। এখন কাঁচামালেই যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে মেশিন যত আধুনিক আর কর্মক্ষমই হোক না কেন সে কিন্তু আশানুরূপ ফল দিতে পারবে না। বাংলাদেশে খামারীরা তাদের খামারের জন্য দু'ভাবে পোল্ট্রি খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকেন। অনেকে কোন পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে খাবার কিনে থাকেন। এসব খাবারে মুরগির বয়স ও প্রকার অনুযায়ী খাবারের বিভিন্ন উপাদন মিশ্রিত থাকে। আবার কিছু কিছু খামারী আছেন যারা খাবারের বিভিন্ন উপাদান

কিনে তা মুরগীর দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী মিশিয়ে খাবার তৈরি করে নেন। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই এবং বহু উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে এ ধরনের আইন থাকলেও তা চর্চা হয় না। অথচ পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের অপরিহার্যতার জন্য খাদ্যের মান অবশ্যই নিশ্চিত করা দরকার।

মেডিক্যাল, প্রাণিসম্পদ ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা যুগ যুগ ধরে বলে আসছেন যে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খামারের জীব জন্তুকে এন্টিবায়োটিকস্ খাওয়ানো উচিত নয়। তথাপি মোরগ-মুরগীর পুষ্টি বিধানকল্পে এন্টিবায়োটিকস্সমৃদ্ধ ফিড এ্যাডিটিভস্-এর ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। মানুষের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত পশুপাখির দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য এন্টিবায়োটিকস গ্রোথ প্রমোটারের (এজিপি) যথেচ্ছ ব্যবহার মানবদেহে প্রতিরোধী শক্তি (resistance) সৃষ্টি করার বিষয়টি সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীদের মাঝে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। এজিপি ব্যবহারের ফলে ওজন বৃদ্ধি ও ফিড এফিসিয়েন্সির উন্নতির বিষয়ে নানা মত ও তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে। তবে বিষয়টির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব উন্নত দেশসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে গ্রোথ প্রমোটার হিসেবে এন্টিবায়োটিকস এর ব্যবহার সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যদিও বিষয়টি এখন পর্যন্ত সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি তথাপি দৈহিক বৃদ্ধির জন্য এন্টিবায়োটিকস্ প্রয়োগ ব্যতীত মোরগ-মুরগী প্রতিপালনের ব্যবস্থা বহু পোল্ট্রি উৎপাদকদেরকেই উৎসাহিত করেছে এবং নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার্য পশুপাখিকে এন্টিবায়োটিকস্ প্রদানের ফলে মানুষের দেহে প্রতিরোধী ব্যকটেরিয়ার জন্ম হয় কী না সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা প্রেক্ষিতে শিল্প মালিকদেরকে স্বভাবতই এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহার সীমিত করতে বাধ্য করেছে। মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং স্বাস্থ্য সমুন্নত রাখার জন্য এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহারের মাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্প দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত ও লাভবান হয়ে আসছে। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে এন্টিবায়োটিকস্-এর ব্যবহার যদি সরকারিভাবে সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে হয়তো খামারিরা চিন্তিত হতে পারেন কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা, কারিগরী ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি যথাযথ ও কঠোরভাবে প্রতিপালিত হলে খামারে রোগের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে এন্টিবায়োটিকস্-এর ব্যবহারও কমে যাবে। পোল্ট্রি প্রোডাক্টস্ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এজিপি এবং ব্যবহার হ্রাস যে কেবলমাত্র একটি কার্যকর ব্যবস্থা তাই নয় বরং তা সচেতন ভোক্তা ও উৎপাদকদের মাঝে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। নিম্নে যে সমস্ত ব্যবস্থাদি আলোচিত হল। তা যদি উৎপাদকগণ যথাযথভাবে জোরদার ও প্রতিপালন করেন তাহলে আশা করা যায়, এন্টিবায়োটিকস্ এর অতি মাত্রায় ব্যবহার হ্রাস পাবে অথবা আদৌ কোন এন্টিবায়োটিকস্-এর প্রয়োজন হবে না।

পাঠ - ৫
কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গ এবং আমাদের করণীয়

গরু মোটাতাজাকরণ বলতে যা বুঝায় তা হল বাড়ন্ত এঁড়ে গরুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩-৪ মাস) উন্নত ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে ওই গরুর শরীরে অধিক পরিমাণ মাংস ও চর্বি বৃদ্ধি করে অধিক লাভে বাজারে বিক্রয় করা। গরু মোটাতাজাকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং প্রাণিজ কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অধিক মাংস উৎপাদনের জন্য বিশ্বের সকল দেশেই বীফ ফ্যাটেনিং করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে গরু মোটাতাজাকরণ একটি জনপ্রিয় ও লাভজনক প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে মূলত কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে এই কর্মযজ্ঞটি সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কোরবানীর ঈদের ৩-৪ মাস আগে থেকে অর্থাৎ রোজার মাস থেকেই শুরু হয় গরু মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া। সারাদেশে অসংখ্য খামারিরা অধিক লাভের আশায় এই সময়ে তাদের কোরবানী উপযোগী গরুগুলোকে মাংসল আর আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মোটাতাজা করছেন। সাধারণত সারা দেশের ব্যাপারীরা হাজার হাজার কোরবানীর গরু নিয়ে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য ঈদের কয়েকদিন আগে থেকেই ঢাকাসহ অন্যান্য শহরমুখী হন। ফলে পশুর হাটগুলো বেশ জমে ওঠে। তখন প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টগুলোর মুল বক্তব্যে ঘুরেফিরে আসে স্টেরয়েড হরমোনের অপব্যবহার। বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে ডেক্সামেথাসন নামের স্টেরয়েডের কথাই শোনা যায় বেশি। সেই সূত্রে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে স্টেরয়েড যেন একটি আতঙ্ক, একটি ভীতির নাম। পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে জনমনে যেন কোন ধরনের আশঙ্কার সৃষ্টি না হয় সেজন্য কোরবানীর গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ ও স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় বিষয়াদি এই লেখনীতে তুলে ধরা হল। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রতি বছর কোরবানী উপলক্ষে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা বাণিজ্য থাকে যার সিংহ ভাগই দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর ঘাম ঝরানো শ্রমের ফসল। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা জরুরি যাতে কোন মহল অহেতুক আতংক ছড়িয়ে কোনরূপ ফায়দা লুটতে না পারে।

চিত্রঃ কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণ।

গরু মোটাতাজাকরণের সঠিক নিয়মাবলী

বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে স্টেরয়েড ব্যবহার না করে সাধারণত ৩-৪ মাসে গরু মোটাতাজা করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। তবে সেক্ষেত্রে গরু বিক্রি করার পূর্বের ছয় সপ্তাহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে হয়। কারণ এ সময়ে যে কোন ধরনের অব্যবস্থাপনা গরুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।

গরু নির্বাচন: মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে পশু নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। মোটাতাজাকরণের জন্য নির্বাচিত পশু সুস্থ ও সবল হতে হয়। যদিও কোরবানীর ঈদে দেশী গরুর কদর বেশি থাকে। তারপরও কোরবানীতে বড় ও সুন্দর গরুর চাহিদা থাকায় গরু মোটাতাজাকরণে খামারিরা বেশি গুরুত্ব দেন উন্নত জাতের গরুর দিকে। আমাদের দেশে মাংসের জন্য গরুর বিশেষ কোন জাত বা বীফ ব্রীড ছিল না। তবে বর্তমান সরকার বিদেশ থেকে মাংসল জাতের ব্রাহমান জাতের ষাঁড়ের বীজ আমাদানি করে কয়েকটি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন করিয়ে সংকর জাতের মাংসল গরু তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যায় কয়েক বছরের মধ্যে মাংসল জাতের গরু পাওয়া যাবে। তবে বীফ ব্রীড না থাকলেও এদেশের রেড সিন্ধি,

শাহিওয়াল ও ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরণের জন্য বেশ ভাল। গরু নির্বাচনে এর বয়সও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে ২.৫-৩ বছরের গরু নির্বাচন করা ভাল। এঁড়ে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধির হার বকনা বাছুরের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তবে বাছুরের বুক চওড়া ও ভরাট, পেট চ্যাপ্টা ও বুকের সাথে সমান্তরাল, মাথা ছোট ও কপাল প্রশস্থ, চোখ উজ্জ্বল ও ভেজা ভেজা, পা খাটো প্রকৃতির ও হাড়ের জোড়াগুলো স্ফীত, পাঁজর প্রশস্ত, বিস্তৃত এবং শিরদাঁড়া সোজা হলে ভাল হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল- পশু ত্রুটিমুক্ত কিনা। তার জন্য পশুর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে তার শিং ভাঙ্গা কিনা, কান কাটা কিনা, চামড়ায় কোথাও ক্ষত আছে কিনা, পা ভাঙ্গা কিনা, লেজ ভাল কিনা, ইত্যাদি নিখুঁতভাবে দেখে মোটাতাজা করার জন্য পশু নির্বাচন করতে হয়।

পশুকে কৃমিমুক্তকরণ ও টিকা প্রয়োগ: বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং প্রচলিত লালন পালন পদ্ধতির কারণে প্রায় ১০০% গরু কোন না কোন কৃমিতে আক্রান্ত। তাই মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই পশুকে কৃমিমুক্ত করতে হয়। এজন্য একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা ভাল। কৃমিকে ধ্বংস করতে সাধারণত ব্রড স্পেক্ট্রাম গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করতে হয় যা পাতাকৃমি, ফিতাকৃমি ও গোল কৃমির বিরুদ্ধে কাজ করে। বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্ন ভিন্ন বাণিজ্যিক নামে এসব ব্রড স্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক ঔষধ বাজারজাত করে থাকে। কৃমিনাশের জন্য ইনজেকশনও রয়েছে যা বিভিন্ন কোম্পানী বাজারজাত করে থাকে। এসব কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করার পর পশুর খাদ্যের প্রতি রুচি বেড়ে যায় এবং এর জন্য যা খাবার খায় তাই শরীর গঠনে ও ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে ও পশুর স্বাস্থ্য ভাল হতে থাকে। এছাড়া গরুকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এনথ্রাক্স বা তড়কা এবং ক্ষুরা রোগের হাত হতে রক্ষার জন্য টিকা প্রদান করতে হয়। তবে অনেক এলাকায় গলাফোলা ও বাদলা রোগের টিকাও প্রদান করতে হয়।

সুষম খাদ্য সরবরাহ: মোটাতাজাকরণে গরুকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করার কোন বিকল্প নেই। তাই গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সুবিধাজনক সময় হচ্ছে বর্ষা এবং শরৎকাল যখন প্রচুর পরিমাণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত ঘাস ছাড়াও গরুকে পর্যাপ্ত দানাদার খাবার দিতে হয় এবং সাথে খড়কে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সরবরাহ করতে হয়। এক্ষেত্রে খড়ের সাথে চিটাগুড় ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করলে খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়। গবাদিপশুর এসব খাবারের সাথে পরিমাণমত ইউরিয়া মিশিয়ে খাওয়ালে খাদ্যের পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, যে সকল পশু জাবর কাটে শুধুমাত্র তারাই ইউরিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। ইউরিয়া পশুর পেটের ভেতর বিশ্লেষিত হয়ে নাইট্রোজেন মুক্ত করে যা পরে মাইক্রোবিয়াল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। প্রোটিনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নাইট্রোজেন। ইউরিয়ায় শতকরা ৪৬.৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তাই ইউরিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অধিক পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, যার ফলে গরু দ্রুত মোটাতাজা হয়। এভাবে মোটাতাজা করা গরুর মাংস স্বাস্থ্যসম্মত। পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহের পাশাপাশি পশুর মালিকগণ ঔষধ প্রয়োগের কৌশল গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁরা স্থানীয় পশুপাখির ঔষধ বিক্রয়ের দোকানদার, মাঠকর্মী, ভেটেরিনারি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরন করে থাকেন। সাধারণত মোটাতাজাকরণে যেসব ঔষধ ব্যবহার করা হয় তা হল-

- ফিড এডিটিভস যেমন প্রোবায়োটিকস, এনজাইম, এমাইনো এসিড, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স, ইউরিয়া ইত্যাদি। সাধারণত গরুকে যেসব খাবার দেয়া হয় তাতে অনেক ভিটামিন ও মিনারেল থাকে। তারপরও অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন ব্যবহার করা যায়। এর ফলে ভিটামিন ও খনিজ লবণের ঘাটতি মিটিয়ে পশুর খাবার শরীরে কাজে লাগে এবং পশম খুব চকচকে হয়। তাছাড়া ক্যালসিয়াম জাতীয় ঔষধে পশু খুব শক্তিশালী হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গরুকে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন প্রয়োগের পরিবর্তে ওরাল ক্যালসিয়ামও খাওয়ানো হয়। গরু মোটাতাজাকরণে এসব ফিড এডিটিভস ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ।
- মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ যেমন বিউটাফসফেন, টলডিমফস ইত্যাদি। অতি দ্রুত গরুর শরীরে মাংস বৃদ্ধির জন্য ভিটামিনের পাশাপাশি টনিক জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। যদিও এসব ঔষধের মূল্য একটু বেশি তবে কার্যকারিতা অত্যন্ত চমৎকার। উল্লিখিত ঔষধ প্রয়োগে পশুর ওজন দ্রুত বাড়ে, পশু দেখতে চক্‌চকে ও রোগমুক্ত থাকে। এসব ঔষধ ব্যবহারের ফলে গরুর মাংসের গুণগত মানের কোন ক্ষতি হয় না বা মাংস খাওয়ার ফলে মানুষের দেহে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে না। বরং সুস্থ পশুর মাংস মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় অধিক নিরাপদ।

- স্টেরয়েড হরমোন যেমন ডেক্সামেথাসন, ডাইইথাইলস্টিলব্রেল, হেক্সাট্রল, জেরানল ইত্যাদি। আমরা জানি স্টেরয়েড এক ধরনের জরুরি জীবন রক্ষাকারী ঔষধ। গরু মোটাতাজাকরণে এর ব্যবহার একটি বড় সমস্যা। আমার জানা মতে খুব কম খামারিই এ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। তবে সমস্যা তৈরি করছেন এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী, যাঁরা গরুকে দ্রুত মোটাতাজাকরণের জন্য এই সকল স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। দ্রুত গরুকে মোটাতাজাকরণের জন্য যেসব বাণিজ্যিক স্টেরয়েড ইনজেকশন ব্যবহার করা হয় তা হল ডেক্সাভেট, ডেক্সাকট, ডেকাসন, ওরাডেক্স, প্রিক্সোনল-এস, প্রেডনিভেট, প্রেডনিসলন ইত্যাদি। আবার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে ডেক্সামেথাজন বা ডেকাসন বা ওরাডেক্সন স্টেরয়েড জাতীয় সস্তা কতকগুলো ট্যাবলেট আসে। গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড হরমোনের ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

স্টেরয়েড কি?

অতি সাধারণভাবে বলতে গেলে স্টেরয়েড এক ধরনের হরমোন যা গবাদিপশু সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণিতে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন জটিল শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। রাসায়নিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী বহু ধরনের স্টেরয়েড হরমোন আছে। তবে মোটা দাগে স্টেরয়েড হরমোনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হল এনাবলিক-এন্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড (এএএস) হরমোন যা জটিল চিকিৎসা কাজে ব্যবহার হয়। এদের অপব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেসন (এফডিএ) ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক এ ধরনের স্টেরয়েড হরমোন ফুড এনিমেল বা দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনকারী প্রাণিতে ব্যবহার সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ। তবে এএএস গ্রুপেরই একটি সিনথেটিক হরমোন হল 'ট্রেনবোলন' যা গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত হয়। এটি শুধুমাত্র ভেটেরিনারি চিকিৎসকের প্রেশক্রিপসান ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা হয়। গরু জবাইয়ের সর্বোচ্চ দুই মাস পূর্বে সাধারণত ইনজেকশন বা কানের চামড়ার নিচে ইমপ্ল্যান্ট আকারে এটি ব্যবহার করা হয়। মুখে খাওয়ালে এর কোন কার্যকারিতা নেই বরং লিভার ড্যামেজ হয়ে প্রাণির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ট্রেনবোলন মূলত শরীরে নাইট্রোজেনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে মাংসপেশী বৃদ্ধি করে। এটি একটি জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি বিধায় বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গরু মোটাতাজা করার জন্য ট্রেনবলন ব্যবহার হয় না। তবে এএএস হরমোন দিয়ে কখনও যাতে গরু মোটাতাজা করা না হয় সে ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন এখনই।

গবাদিপশু এবং আমাদের শরীরে আরেক ধরনের স্টেরয়েড হরমোন তৈরি হয় যা করটিকোস্টেরয়েড নামে পরিচিত। করটিকোস্টেরয়েড কিডনির ওপরে অবস্থিত এড্রেনাল গ্ল্যান্ড হতে তৈরি হয় ও সরাসরি রক্তে মিশে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ সম্পাদন করে। এছাড়াও এটি স্ট্রেস রেসপন্স বা ধকল সামলানো যেমন ধস্তাধস্তি জনিত ধকল বা একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহন জনিত ধকল প্রতিরোধ, ব্যথানাশ ও পানিশূন্যতা রোধ, অনাহার জনিত বিষক্রিয়া যেমন কিটোসিসের চিকিৎসা ও ক্যান্সারের সহচিকিৎসা ছাড়াও আরো বহুবিধ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। করটিকোস্টেরয়েডকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লাইফ সেভিং হরমোনও বলা হয়। গরু মোটাতাজাকরণে বহুল অলোচিত ডেক্সামেথাসন হরমোন কোরটিকোস্টেরয়েড গ্রুপের একটি সিনথেটিক হরমোন। এটি প্রাকৃতিক হরমোনের চেয়ে প্রায় বিশগুণ শক্তিশালী বিধায় স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার বেশ কার্যকরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এটি অতীব জরুরি ঔষধ হিসেবে তালিকাভুক্ত। প্রাণি ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় এটি নিরাপদ বিধায় ফুড এনিমেল অর্থাৎ দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী প্রাণির চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। করটিকোস্টেরয়েড গ্রুপের হরমোনের হাফ লাইফ বা অর্ধায়ু অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ, করটিসল এক ধরনের করটিকোস্টেরয়েড যার অর্ধায়ু মাত্র ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট। অন্যদিকে ডেক্সামেথাসনের অর্ধায়ু প্রায় ৩৬ ঘণ্টা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ'র নির্দেশনা অনুযায়ী ডেক্সামেথাসনের উইথড্রয়াল পিরিয়ড শূন্য। অর্থাৎ কোন প্রাণিতে ডেক্সামেথাসন ব্যবহার করলে ওই প্রাণির মাংস বা দুধ খাওয়ার জন্য কোন অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গরু জবাইয়ের পূর্ব মুহূর্তেও ধস্তাধস্তির কারণে এড্রেনাল গ্ল্যান্ড হতে প্রচুর পরিমাণে করটিকোস্টেরয়েড নির্গত হয়। নির্গত এসব করটিকোস্টেরয়েড সাথে সাথে রক্তে মিশে যায়। যেহেতু এটি শরীরে কোথাও জমা থাকেনা এবং আমরা রক্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করিনা তাই এতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। তবে মোটাতাজাকরণ কালীন সময়ে মূলত

কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গ এবং আমাদের করণীয়

যেসব গরু দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় সেসব গরুতে কিছু মেডিকেল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন প্রাণিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য উভয় বিচারে জবাইপূর্ব ঐসব গরুতে ডেক্সামেথাসন ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে- যেমন পরিবহনকালীন সময়ে পানিশূন্যতা রোধ, পরিবহনজনিত ব্যথা ও ধকল নিরাময়, অনাহারের পর অতিরিক্ত দানাদার খাদ্যের দ্বারা সৃষ্ট বিষক্রিয়া হতে কোরবানীর গরুকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। ডেক্সামেথাসনের এই ব্যবহার মোটাতাজাকরণ সম্পর্কিত নয় এটি চিকিৎসা সম্পর্কিত। তবে পরিবহনকালীন যে কোন অবস্থারই সৃষ্টি হোক না কেন, ডেক্সামেথাসন একটি প্রেসক্রিপসন ড্রাগ এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করা উচিত নয়। এর অপব্যবহার বহুবিধ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ ও সতর্কতা প্রয়োজন।

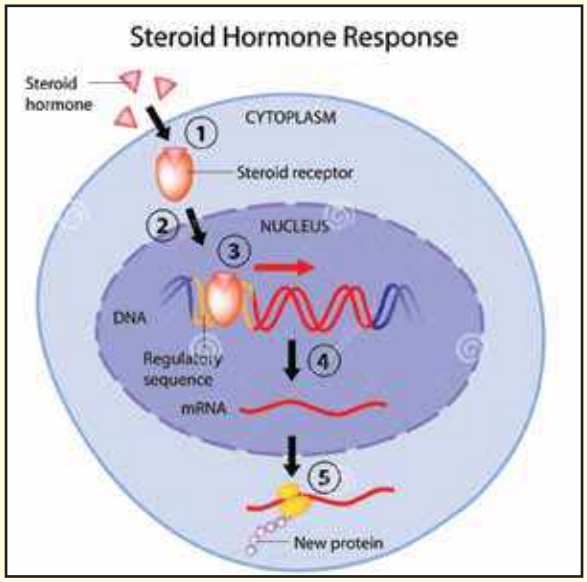

চিত্রঃ স্টেরয়েড হরমোনের কার্যপদ্ধতি।

স্টেরয়েড হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব

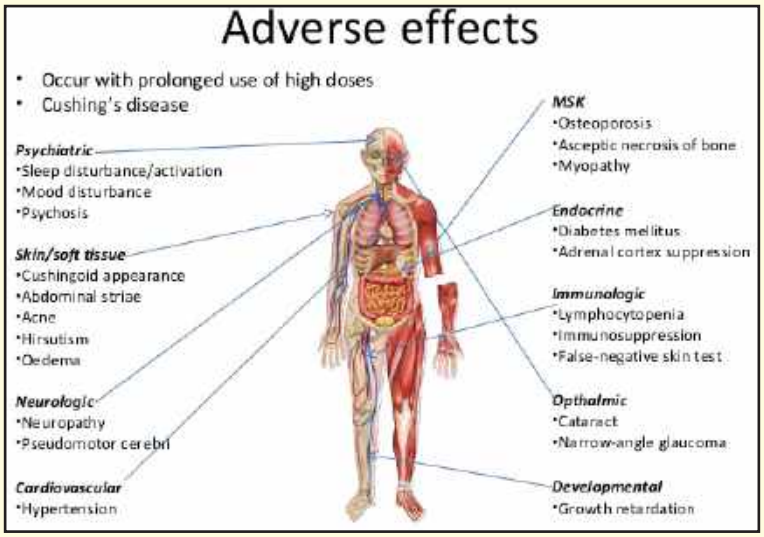

চিত্রঃ জনস্বাস্থ্যে স্টেরয়েড হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার দোষের নয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের ফার্মেসিগুলোতে গিয়ে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই যে কেউ এসব স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ কিনতে পারেন। ফলে অবৈধ উপায়েও স্টেরয়েড ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে শতকরা কত ভাগ গরুতে এর ব্যবহার হচ্ছে তার কোন পরিসংখ্যান জানা নেই। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষকরাও অধিক লাভের আশায় গরু মোটাতাজা করতে অনেক উচ্চমাত্রায় দীর্ঘদিন স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার করছেন। মানুষের বেলায় যেমন দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে দীর্ঘমেয়াদি পারিপার্শ্বিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তেমনি পশুর ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা থেকেই যায়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে গরুর শরীরে চর্বি জমে। ফলে গরুর দেহের আকার বেড়ে যায় কিন্তু তুলনামূলক ওজন হ্রাস পায়। উক্ত গরুর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে যায় এবং উক্ত পশুকে স্বাভাবিক দৃষ্টিকোন থেকে অসুস্থ মনে হয়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে পশুর অতিরিক্ত তৃষ্ণা পায় এবং প্রশ্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে কোষে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দৃশ্যত গরুকে মোটা দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সকল গরুর মাংসের পরিমাণ বেশি হলেও তার গুণগতমান অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে স্টেরয়েড হরমোনের কারণে গরু ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগতে থাকে। দীর্ঘদিন উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েড ঔষধ ব্যবহার করা হলে তা শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রান্ত হবার আগেই জবাই করা হলে মাংসের মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে চলে যায়। এই জাতীয় গরুর মাংস যদি মানুষ নিয়মিত গ্রহণ করে, তাহলে মানুষের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধমনী চিকন হয়ে হৃদরোগ এমনকি ব্রেন স্ট্রোকও হতে পারে। এ সকল হরমোন এতটাই মারাত্মক যে মাংস রান্না করার পরও তা নষ্ট হয় না। ফলে তা মানুষের শরীরে গিয়ে অনাকাঙ্খিত বৃদ্ধি, কিডনি ও লিভারসহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব, মেয়েদের অল্প সময়ে পরিপক্কতা এবং শিশুদের অল্প বয়সে মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এ সকল স্টেরয়েড হরমোন। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা পশুর মাংস হয়তো দুই-এক দিন খেলে কিছু হবে না। কিন্তু নিয়মিত খেলে, কিংবা অভ্যাসে পরিণত হলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমরা লক্ষ্য করি, কোরবানির ঈদে বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ে। বেশি বেশি মাংস খেয়ে পেটের পীড়াসহ হৃদরোগে আক্রান্ত এমনকি স্ট্রোক হয়ে প্রচুর রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে ঈদের সময় হাসপাতালে অধিক রোগী ভর্তির সাথে কোরবানীর পশুতে স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহারের সম্পর্ক নেই। এটা মূলত উক্ত সময়ে অধিক পরিমান মাংস গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। যাইহোক মাংসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ স্টেরয়েড ঔষধ মানুষের দেহে আসলে যে সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে সেগুলো হল ক) যকৃতের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, খ) রক্তে কোলেস্টরল বৃদ্ধি, গ) ত্বকে ব্রণ জাতীয় ক্ষত সৃষ্টি, ঘ) টাক পড়ে যাওয়া, ঙ) রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব, চ) মহিলাদের দেহে পুরুষালী লক্ষণ প্রকাশ, ছ) দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, জ) পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির স্ফীতি, ঝ) রক্ত চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, ঞ) বৃক্কের সমস্যা, ট) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, ঠ) পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়া এবং ড) দেহের হরমোনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া।

আইনগত দিক

বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে গবাদিপশুতে স্টেরয়েড প্রয়োগের সুযোগ নেই। 'মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' (২০১০ সালের ২ নং আইন) ১৪ নং ধারা অনুযায়ী পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করেন তবে উক্ত আইনের ২০ নং ধারা অনুযায়ী সেই ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য এক বছরের কারাদন্ড, বা অনূর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। তাছাড়া 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' (২০১১ সনের ১৬ নং আইন) এর ১৪ নং ধারার বিধি মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী পশু পরিবহন ও বিপণন করতে হবে। উক্ত আইনের ২১ (গ) নং ধারার বিধান মোতাবেক কারকাস, কারকাসের অংশ, মাংস প্রভৃতিতে জীবাণু, ভারী ধাতব বস্তু, বিষাক্ত বস্তু, হরমোন, প্রিজারভেটিভ ইত্যাদির গ্রহণযোগ্য মাত্রা থাকতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন প্রথমবার লঙ্ঘন করেন তবে তাহলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদন্ড অথবা অনুর্ধ্ব ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। উপর্যুক্ত আইনদ্বয় ছাড়াও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার

সম্প্রতি 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) প্রণয়ন করেছে। এই আইনের ৩০ নং ধারা মোতাবেক নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমান কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় দন্ডনীয় অপরাধ। প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দন্ড হল অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

আমাদের করণীয়

গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে সীমিত সময়ে অধিক মাংস উৎপাদন বর্তমানে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পরিমিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কিন্তু অনেকেই গরুর দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য পরিমিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের ফিড এডিটিভস, মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ ও স্টেরয়েডস্ ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফিড এডিটিভস এবং মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ভাল ফলাফল পাওয়া গেলেও লক্ষ্য করা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খামারিরা বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই নিজের পছন্দমত এসমস্ত ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি ঔষধ প্রদানের মাত্রাও নিজেরাই ঠিক করে থাকেন। নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা বা রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি স্টেরয়েডস্ উৎপাদন করেন। কিন্তু খামারিরা এর ক্ষতিকর দিকসমূহ না জেনে বা বিবেচনা না করেই গরু মোটাতাজাকরণের জন্য তা ব্যবহার করে থাকেন। এজাতীয় ঔষধ সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন উপকার পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি যথেচ্ছা ব্যবহার করলে এর প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই ক্ষতিকর প্রভাব শুধু যে গরুতেই পড়ে তা নয় বরং মানুষ বা জনস্বাস্থ্যের উপরও পড়ে। তাছাড়া বাংলাদেশে কতিপয় সমস্যার কারণে বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ পেশাটি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। এসকল বিষয়ে আমাদের করণীয় বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হল।

- বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন তার চাহিদা মেটানোর জন্য খামারিদেরকে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীরা গরু মোটাতাজাকরণের কলা-কৌশল সম্প্রসারিত করছেন। তবে মোটাতাজাকরণের জন্য ভাল জাতের গরুর অভাব রয়েছে। যদিও সরকার খুব সীমিত পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে আমেরিকা থেকে ব্রাহমান জাতের ষাঁড়ের বীজ আমদানি করে দেশীয় জাতের গাভীকে প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাত তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে, কিন্তু সে ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া পশুখাদ্য, ঔষধ ও প্রতিষেধকের অত্যধিক মূল্য এই উদীয়মান শিল্পকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই কৃষি খাতের ন্যায় এ শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সরকারকে পশুখাদ্য, ঔষধ ও ভ্যাকসিনের ওপর ভর্তুকি দিতে হবে। দেশে চাহিদা থাকায় প্রতিনিয়ত চোরাচালান পথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমার থেকে যে গরু আসছে তা অনেক ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত থাকায় তা দেশের প্রাণিসম্পদকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করছে। ফলে দেশীয় মোটাতাজাকরণ প্রকল্প ধ্বংস হতে চলেছে। সরকার যদি বৈধভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পশু আমদানিসহ 'বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০০৫' (২০০৫ সনের ৬ নং আইন) প্রয়োগ করে তবে এ সমস্যার সমাধান হবে।
- ভেজাল খাবারে দেশ ভরে গেছে এ কথা যেমন সত্য তেমনি খাঁটি খাবার যে নেই তাও অসত্য নয়। বর্তমানে বিষাক্ত ও খাঁটি দু'ই মিলিয়ে চলছে আমাদের দেশ। বিপাকে পড়তে হচ্ছে উৎপাদনকারী ও ক্রেতাদের। মাঝখানে অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামত পকেট ভরে নিচ্ছে। বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার ও খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী নীতিমালা ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় কোনটি ভেজাল আর কোনটি খাঁটি তা পার্থক্য করা কঠিন। যেহেতু গবাদিপশুতে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ মাংসের গুণাগুণ নষ্ট করে দেয় এবং মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, তাই মোটাতাজা করার জন্য গরুতে স্টেরয়েডের ব্যবহার মোটেই কাম্য নয়। বিষয়টি কঠোর হস্তে দমনের জন্য দ্রুত সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে দ্রুত 'পশু জবাই ও মাংস নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' (২০১১ সনের ১৬ নং আইন) বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক কসাইখানার ব্যবস্থা করে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পশু ও মাংস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে এ শিল্প বাংলাদেশে একটি সম্ভবনাময় খাত হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।

- পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে মোটাতাজা করণের গরুতে ইনজেকশন বা ঔষধ প্রয়োগ মানেই তা স্টেরয়েড ব্যবহার নয়। ব্যবহৃত ঔষধ হতে পারে কৃমিনাশক, ফিড এডিটিভ বা মেটাবোলিক স্টিমুলেন্টস। তবে তা স্টেরয়েডও হতে পারে। কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই সাংবাদিক ভাইরা ঢালাওভাবে প্রচার শুরু করছেন যে মোটাতাজা বা ফ্যাটেনিং গরুকে বিষাক্ত ঔষধ বা স্টেরয়েড খাওয়ানোর মাধ্যমে মোটাতাজা করা হচ্ছে। এদের মাংস মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই কোরবানীর ঈদের পূর্বে সংবাদপত্র ও মিডিয়া যে ভাবে তথ্য বিভ্রাট মূলক খবর ছড়ায় তাতে যে সব খামারি একবুক আশা নিয়ে গরু লালন পালন করেন তাদের সেই আশার গুড়ে বালি দেয়া হয় কিনা এটা অনুধাবন করার সময় এখনই। হ্যাঁ স্টেরয়েড ব্যবহার করা গরুর মাংস মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন হুমকি তেমনি সুস্থ সবল ও স্বাস্থ্যবান গরুর মাংস বা প্রোটিন মানুষের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ। তাই হুট করে না জেনে শুনে তথ্য বিভ্রাট ঘটালে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ও ধনী ব্যক্তিবর্গ কোরবানী দিতে অনীহা প্রকাশ করবেন পাশাপাশি এদেশের মানুষ প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগবে।
- অসুস্থ পশুপাখি চিকিৎসার পাশাপাশি ভেটেরিনারিয়ানদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল ঔষধের অবশিষ্টাংশমুক্ত প্রাণিজ খাদ্য যেমন দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন নিশ্চিত করা। এছাড়াও তাদের দায়িত্ব হল এ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি খামারি ও গ্রাম্য চিকিৎসকদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করা যাতে তাদের অপচিকিৎসার ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে না পড়ে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়সমূহ, পরিবেশবিদ, ফার্মাসিস্ট এবং দেশের সকল বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এ ব্যাপারে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে সকল ভেটেরিনারিয়ানদের যে বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন তা হল- ক) রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসাসেবা প্রদান; খ) সঠিক রোগ নিরূপণ করে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ; গ) প্রয়োজনে পশুপাখির রোগ নির্ণয় কেন্দ্র/গবেষণাগারের সহায়তা গ্রহণ; ঘ) ঔষধের প্রত্যাহারকাল সম্বন্ধে গ্রাম্য ডাক্তার ও খামারিদেরকে সঠিক জ্ঞানদান; ঙ) ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রাম্য ডাক্তার ও খামারিদেরকে ধারণা দেয়া; চ) প্রাণিজ খাদ্যে ঔষধের অবশিষ্টাংশ সঞ্চিত হওয়া ও জনস্বাস্থ্যের ওপর এর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে মত বিনিময়।
- গত বছর সরকার তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পশুর হাটগুলো তদারকি করে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগে মোটা পশু চিহ্নিত করতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি একটি ভাল উদ্যোগ। আশাকরি এ বছরও উদ্যোগটি অব্যাহত থাকবে। ডাক্তাররা যে রকম দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েড গ্রহণকারী রোগী দেখেই চিনতে পারেন, ঠিক সেরকম অভিজ্ঞ ভেটেরিনারি চিকিৎসকরাও এ ধরনের স্টেরয়েড খাওয়ানো পশু দেখেই শনাক্ত করতে পারবেন। অনৈতিকভাবে স্টেরয়েড বা হরমোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া উচিত, এমনকি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপসংহার

কোরবানির ঈদ মুসলমানদের জন্য অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। কোরবানির ঈদে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশ্বজুড়ে সাধারণত গৃহপালিত পশু কোরবানি দেওয়া হয়। কোরবানীর অর্থ হল-ত্যাগ। তাই যে যত ভাল ও দামী পশু কোরবানী দিতে পারে সে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্যলাভ করে এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। ইসলামের বিধান মতে কোরবানীর পশু হতে হবে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত। আর স্টেরয়েডে মোটাতাজা করা গরু কখনই সুস্থ নয়। এসব গরুর চঞ্চলতা কম এবং নড়াচড়া কম করে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কোরবানীর ঈদ প্রায় আগত। তাই ইতোমধ্যে মুসলিম ভাইরা কোরবানীর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করছে। তবে এটা বলা যায়, মোটাতাজা গরু কোরবানীর জন্য আতঙ্ক নয় বরং অধিক নিরাপদ। কোরবানীর জন্য মোটাতাজা গরু অবশ্যই ক্রয় করা যাবে, কারণ এসব গরুর মাংসের গুণাগুণ রুগ্ন ও চিকিৎসাবিহীন গরুর চেয়ে অনেক ভাল। তাছাড়া মোটাতাজাকরণ গরু রোগমুক্ত হওয়ায় যেসব রোগ পশু থেকে মানুষে সংক্রামিত হয় তা হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। তাই সংবাদপত্রের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিশ্চিন্তে এসব গরু কোরবানীর জন্য নির্বাচন করা যাবে এবং মাংস নিঃসন্দেহে খাওয়া যাবে। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধের ব্যবহার বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই। নতুবা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প শিল্প হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। সেই সাথে জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০০৫, মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক যতশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পাঠ - ৬
পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিক গ্রোথ প্রোমোটারের ব্যবহারে জনস্বাস্থ্যের হুমকি

বাণিজ্যিকভাবে পোল্ট্রি শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ফলে প্রাণীজ আমিষ সরবরাহের ক্ষেত্রে বর্তমানে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে বিষয়টি নানা ধরনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে তা হচ্ছে মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য খাদ্যে ব্যাপক হারে এন্টিবায়োটিকস্-সমৃদ্ধ গ্রোথ প্রমোটার (এজিপি) ব্যবহারের ফলে দেহে এর অবিশষ্টাংশের জমায়েত (residual efect) এবং মানবদেহে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া- উদ্ভুত একটি জটিল পরিস্থিতি। এ অবস্থা উত্তোরণকল্পে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে খাদ্যের সাথে গ্রোথ প্রোমোটারের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মূলত এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই জৈব মুরগি উৎপাদন প্রচেষ্টা উজ্জীবিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে জৈব ও প্রাকৃতিক (organic and natural) পোল্ট্রি উৎপাদন সাম্প্রতিক সময়ে চালু রয়েছে এবং বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের উৎপাদন সেক্টর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায় বলা যায় যে, এ যেন বহু বছর পূর্বে যখন নিবিড়ভাবে পোল্ট্রি পালন এবং রোগ দমন বা রোগ জীবাণু ধ্বংসের জন্য ঔষধপত্র, কীটনাশক এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়নি তখনকার সেই অবস্থার মাঝে পুনঃ প্রত্যাবর্তন। মাংসে ঔষধ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকস্ ও রাসায়নিক পদার্থের অবশিষ্টাংসের উপস্থিতি, পশুপাখির কল্যাণ এবং অব্যাহতভাবে কৃষি নির্ভরতা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্বিগ্নতার কারণে জৈব পোল্ট্রি বাজারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এন্টিবায়োটিক মুক্ত জৈব ও প্রাকৃতিক পোল্ট্রি এবং প্রচলিত পোল্ট্রি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু এসব ধরনের পোল্ট্রি উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একই। বর্তমানে পোল্ট্রির খাদ্যে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার স্বেচ্ছায় অথবা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু জৈব পোল্ট্রি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকস্, এন্টিককসিডিয়ালস, দৈহিক বর্ধক এবং কৃত্রিম কেমিক্যালস্-এর ব্যবহার অনুমোদিত নয় সেহেতু এ ব্যবস্থার জন্য কঠোর বায়োসিকিউরিটি এবং অতি উন্নতমানের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করতে হবে। বিকল্প স্ট্র্যাটেজী হিসেবে যেসব ফ্যাক্টরস বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে; পশুপাখির ব্যবস্থাপনা পুষ্টি, ফিড এ্যাডেটিভস্, রোগ নির্মূল, জেনিটিক্স, ভ্যাকসিন প্রদান ইত্যাদি। উৎপাদকগণ বর্তমানে নতুন ও আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি যা কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে তা অনুসরণ করছেন (যেমন প্রোবায়োটিকস্-এর ব্যবহার)। জৈব পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যবস্থাটি অতি সংবেদনশীল একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে জৈব পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এজন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে;

- যথাযথ বায়োসিকিউরিটি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করে রোগের মাত্রা হ্রাস। রোগের অনুপ্রবেশ রোধ এবং যখন রোগের প্রাদুর্ভার দেখা দেয় তখন গৃহীত ব্যবস্থাবলী প্রকৃতপক্ষে বায়োসিকিউরিটিকে আরো সুদৃঢ় করে।

- ইমিউন স্ট্যাটাসকে উন্নীত করার জন্য ধকল হ্রাস। এজন্য প্রয়োজন উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা, সঠিক তাপমাত্রা, আবাসস্থলের পর্যাপ্ততা, যথাযথ ভেন্টিলেশন ও উন্নত লিটার ব্যবস্থাপনা, সঠিক পুষ্টি এবং বিশুদ্ধ পানি/খাদ্য সরবরাহ। এছাড়াও প্রাকৃতিক পদ্ধতি/স্ট্র্যাটেজী যেমন প্রিবায়োটিকস্, প্রোবায়োটিকস্ এবং কমিউটেটিভ এক্সক্লুশান দ্বারা অন্ত্রনালীর মারাত্মক সমস্যাবলী যেমন নেক্রোটিক এন্টারাইটিস এবং ককসিডিওসিসের সংক্রমণ হ্রাস করা যায়। জৈব উৎপাদনের জন্য পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতা রক্ষা করা একান্ত অপরিহার্য।

- সংক্রামক রোগ দমনকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী ভ্যাকসিন প্রদান। চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কেবলমাত্র সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে।

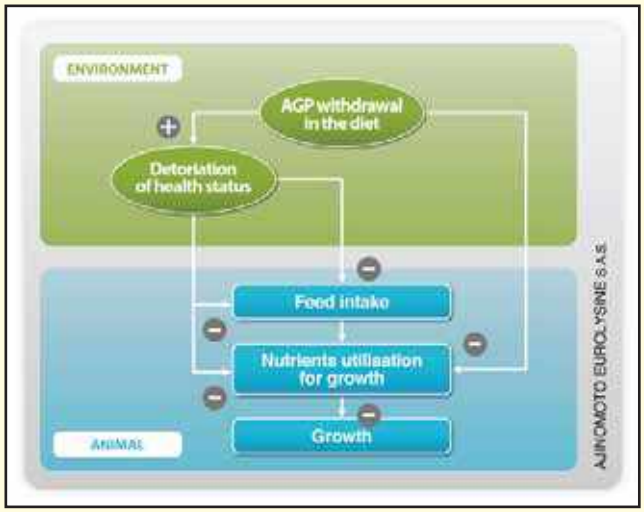

চিত্রঃ এন্টিমাইক্রোবিয়াল গ্রোথ প্রোমোটার প্রত্যাহারে প্রাণিস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব।

জৈব পোল্ট্রি উৎপাদনের আদর্শ ব্যবস্থাবলী যা USDA National Organic Programme Standards এর অন্তর্ভুক্ত সেখানে কৃত্রিম ঔষধের ব্যবহার অনুমোদিত নয়। প্রয়োজন ব্যতীত সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয় এবং চিকিৎসার পর সংশ্লিষ্ট মুরগিদেরকে সেখান থেকে অপসারণ করতে হয়। জৈব উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহিরাঙ্গনে বিচরণের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু তা নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বা বিরাটত্বের উপর। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ঘরের সংলগ্ন অঙ্গন থাকে এবং ছোট প্রতিষ্ঠানে বহনযোগ্য ঘরের ব্যবস্থা থাকে। রোগ দমনের জন্য চারণক্ষেত্র পরিবর্তনের (rotation) বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক জৈব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যেগুলো ছোট আকারের ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত সেখানে প্রায়শ; একই ঘরে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন প্রজাতির মুরগি প্রতিপালিত হয়। পাতিহাঁস, রাজহাঁস ও টার্কি অনেক রোগ বহন করে যা মুরগিকে আক্রান্ত করতে পারে; আবার মুরগি থেকেও এরা আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়াও বয়স্ক মুরগিরা অনেক রোগের বাহক হতে পারে যা ছোট্ট বাচ্চা যাদের ইমিউন সিস্টেম পরিপূর্ণভাবে পূর্ণতা পায়নি তাদের জন্য মারাত্মক ও ভয়াবহ হতে পারে।

রোগের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য বায়োসিকিউরিটি হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যা অন্তরণ বা isolation এর ধ্যান-ধারণার একটি অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মুরগির ঘর প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য মুরগিদের থেকে স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। সেখানে কেবলমাত্র ভেটেরিনারি চিকিৎসরগণই প্রবেশ করতে পারবেন। তাঁদেরকে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করে গোসল করে খামারে যেতে হবে। বয়স্ক মুরগিদেরকে দেখাশুনার করার পূর্বেই ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে বড়দের থেকে কোন সংক্রমণ এদের দেহে বিস্তার না করে। কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হ্যাচারী থেকে একদিনের রোগমুক্ত বাচ্চা ক্রয় করা উচিত। মনে রাখতে হবে, স্যানিটেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুরগির ঘরে কোন ধরনের রোগ-জীবাণু অনুপ্রবেশ রোধকল্পে জীবাণুনাশকপূর্ণ ফুটবাথ ব্যবহার কতে হবে। এই জীবানুনাশক নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রমাণিত কার্যক্ষমতা সম্পন্ন জীবাণুনাশক নির্বাচন করতে হবে যাতে তা বায়োফিল্মের ভিতর অনুপ্রবেশ করে তা দূরীভূত করতে পারে। কারণ জীবাণু-নাশক যদি অকার্যকর হয় তাহলে খামারের বায়োসিকিউরিটি ভঙ্গুর হয়ে পড়বে এবং তার ফলাফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক। খামারে যানবাহনের প্রবেশ ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি গ্রহণের পূর্বে তাতে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। ময়লা পরিষ্কারক (detergent) দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার করলে অধিকাংশ রোগজীবাণু দূরীভূত হয়। এরপর স্যানিটাইজার যেমন ক্লোরিন ব্লিচ দ্বারা অনুজীব ধ্বংস করতে হবে। জৈব পদার্থ যেমন মাটি জীবাণুনাশকের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্থ করে। সূর্যকিরণও (অতি বেগুনী রশ্মি) একটি কার্যকর জীবাণুনাশক এবং রৌদ্রতাপে শুষ্ক হবার পদ্ধতির কারণে অনুজীবের জৈবিক কার্যকর ক্ষমতা হ্রাস পায় ও এদের বহুলাংশের মৃত্যু ঘটে। মুরগির অপসারণ অতীব জরুরি। 'অল-ইন, অল-আউট' পদ্ধতির

মাধ্যমে বহু রোগজীবাণু বিদূরিত করা সম্ভব কারণ এরা কেবলমাত্র জীবিত মুরগিদের মাঝেই বোঁচে থাকে। মৃত মুরগিকে সঠিক নিয়মানুযায়ী আগুনে পুড়িয়ে অথবা মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ দমনের জন্য ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রয়লারের জন্য নিউক্যাসেল, ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস এবং ইনফেকশাাস বারসাল ডিজিজ ভ্যাকসিন প্রদান করা প্রয়োজন। এসব ভ্যাকসিন এক দিনের বাচ্চাতে এবং/অথবা ১০ থেকে ১৪ দিন বয়সের সময় প্রয়োগ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদকদের ইচ্ছানুযায়ী সালমোনেলার ভ্যাকসিনও প্রদান করা হয়ে থাকে। ব্রয়লার ব্রিডার ও লেয়ারদের ক্ষেত্রে মডিফায়েড লাইভ ভ্যাকসিনের সংমিশ্রণ ব্যবহৃত হয় এবং তারপর ইনএ্যাকটিভেটেড ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। অনেক হ্যাচারী একদিনের বাচ্চাদেরকে নিয়মিতভাবে এন্টিবায়োটিকস্ প্রয়োগ করে থাকে। সুতরাং বাচ্চা গ্রহণের পূর্বে এ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জেনে নিতে হবে। মোরগ-মুরগীর প্রধান রোগসমূহ হচ্ছে;

- শ্বাসতন্ত্রের; নিউক্যাসেল, ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস
- রোগপ্রতিরোধ শক্তি অবদমনকারী (immunosuppressive); ইফেকশাস বারসাল ডিজিজ, ম্যারেক্স ডিজিজ
- আন্ত্রিক, নেক্রটিক এন্টারাইটিস, ককসিডিওসিস

উৎপাদকগণকে এসমস্ত রোগের লক্ষণসমূহ সনাক্ত করার ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। মৃত অথবা রোগাক্রান্ত মুরগির ময়নাতদন্ত অনেক মূল্যবান তথ্যাদি প্রদান করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোগপ্রতিরোধ শক্তি অবদমনকারী রোগের উপস্থিতির কারণে বারসাল গ্ল্যান্ডের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। জৈব পদ্ধতিতে প্রতিপালিত মুরগি যেহেতু বহিরাঙ্গনে বিচরণের সুযোগ পায় সেহেতু বন্য প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। এরা ফাউল কলেরা (পাসচুরেলা মালটোসিডা), সালমোনেলা, ফাউল পক্স প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। জলচর পাখি যেহেতু এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বাহক সেহেতু জৈব মুরগি এদের থেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হতে পারে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হাইলি প্যাথজেনিক অথবা লো প্যাথজেনিক এই দু'ধরনেরই হতে পারে।

জৈব উৎপাদনের ক্ষেত্রে ককসিডিওসিস দমনের জন্য নিয়মিত ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন নাও হতে পারে। ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যেন ককসিডিয়ার সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে থাকে এবং তার ফলে ন্যুনতম সংক্রমণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হবে। ছোট মুরগির খামার যেখানে মুরগির সংখ্যাধিক্যতার সমস্যা নাই সেখানে পরজী-বীর সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকায় ঔষধ প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। লিটার শুষ্ক এবং ব্রুডিং অঞ্চল পরিষ্কার রাখতে হবে। অতিরিক্ত যানবাহন সংলগ্ন বহিরাঙ্গন ককসিডিয়ার ওসিষ্ট বিস্তার ঘটাতে পারে বলে এক্ষেত্রে নিরপত্তা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। পানির পাত্র ও ফিডারের অবস্থান মাঝে মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। এই সাথে বহিরাঙ্গনও পরিবর্তন (rotation) করতে হবে। অনেক জৈব উৎপাদনকগণ ককসিডিয়া দমনের জন্য ভ্যাকসিন ব্যবহার করেন।

নেক্রটিক এন্টেরাইটিস অন্ত্রনালীর একটি রোগ যা ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস্ কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং এ রোগের মৃত্যুর হার যথেষ্ট বেশি। উল্লেখ্য যে, সাধারণত: পোল্ট্রি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত পদ্ধতি মোতবেক খাদ্যের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিকস্ প্রদান করে এ রোগ দমন করা হয়। তবে যেহেতু সম্প্রতি রুটিন অনুযায়ী এন্টিবায়োটিকস্ প্রয়োগের উপর বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে সেহেতু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এর ফলে বৃহৎ বৃহৎ পোল্ট্রি প্রতিষ্ঠানে নেক্রটিক এন্টেরাইটিসের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এজন্যই এন্টিবায়োটিকস্-এর বিকল্প প্রয়োগের দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। এ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ফিড কন্ডিশনিং এবং কম্পেটিটিভ এক্সক্লুশন (competitive exclusion)। যেহেতু খাদ্য থেকে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে সেহেতু তা অবশ্যই যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাত অথবা কন্ডিশন্ড হতে হবে যাতে রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এন্টিবায়োটিকস্-এর বিকল্প হিসেবে জৈব এসিডসমূহ মোটামুটি কার্যকর হয়ে থাকে। কম্পেটিটিভ এক্সক্লুশন একটি পদ্ধতি যা দ্বারা উপকারী অনুজীবসমূহ অন্ত্রনালীর রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুদেরকে পরাভূত করে হোস্টের স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নতি ঘটায়। এছাড়াও স্বাস্থ্যবান সুস্থ রোগমুক্ত বয়স্ক মুরগিদের অন্ত্রনালীর মাইক্রোফ্লোরা ছোট বাচ্চা মুরগিদেরকে প্রয়োগ করলেও রোগজীবাণুর জমায়েতের বিরুদ্ধে তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রোবায়োটিকস্ হচ্ছে উপকারী নির্বাচিত জীবিত অনুজীব যা খাদ্যের সাথে নিয়মিত

পরিবেশিত হলে অন্ত্রনালীর মাইক্রোফ্লোরার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এর ফলশ্রুতিতে হোস্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। প্রোবায়োটিকস্ ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিডের (volatile fatty acids) পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যদিও এই প্রক্রিয়ার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জানা যায়নি তথাপি এর দ্বারা অন্ত্রনালীর স্বাভাবিক মাইক্রোফ্লোরার যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা অবশ্য পরীক্ষিত।

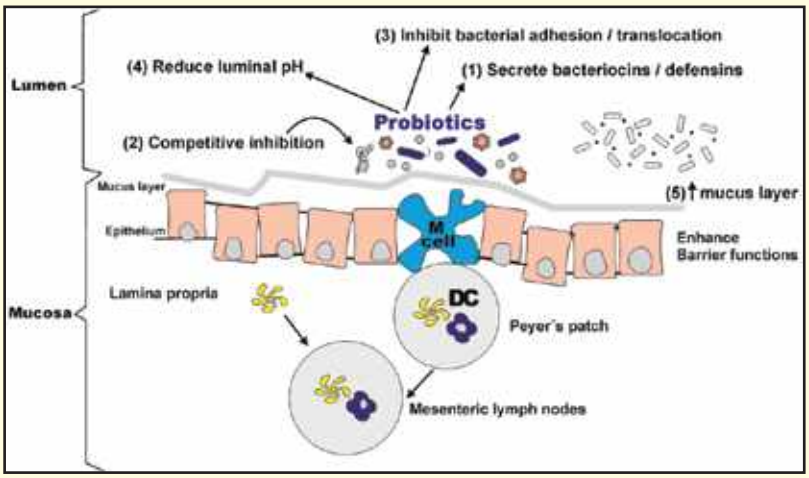

চিত্রঃ প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়াকে বাধাদানের পদ্ধতি।

প্রোবায়োটিকস্-এর উদাহরণ হিসেবে ARGON H120, LACBIO & FMB-11 প্রোডাক্টের ল্যাকটোবেসিলাস প্রজাতির নাম উল্লেখ করা যায়। এসব অনুজীব অন্ত্রনালীতে ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস্-এর ন্যায় একই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাদেরকে পরাভূত করে থাকে। এসব ব্যাকটেরিয়া যখন 'প্রিবায়োটিক' যেমন ল্যাকটোজের সাথে (খাদ্যের সাথে ০.১% হারে) পরিবেশিত হয় তখন এর কার্যকারিতা আরো অধিক পরিমাণে উন্নীত হয়।

প্রিবায়োটিকস্ হচ্ছে অপরিপাচ্য খাদ্য উপাদান যা হোস্টের বৃহৎ অন্ত্রে অবস্থানকারী এক বা একাধিক ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি যারা হোস্টের কল্যাণের নিমিত্তে কর্মতৎপরতা উদ্দীপিতকরণের মাধ্যমে হোস্টের দৈহিক বৃদ্ধিতে উপকারী ভূমিকা পালন করে। প্রিবায়োটিকস্ অনুজীবদের ভারসাম্য (balance) এমনভাবে পরিবর্তন করে যাতে উপকারী অনুজীবসমূহ বলশালী হয়ে উঠে। প্রিবায়োটিকস্ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটোব্যাসিলাস এসিডোফিলাস এর বংশবিস্তারকে উদ্দীপ্তকরণ। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় ফ্রুকটোঅলিগোস্যাকারাইডস্ যা অনুজীবদের শক্তি জোগানোর অন্যতম উৎস। অলিগোস্যাকারাইডস্ একজাতীয় প্রিবায়োটিকস্ যা হচ্ছে জটিল শর্করা এবং তা উন্নত প্রজাতির জীবজন্তু কর্তৃক সঠিকভাবে পরিপাক হয় না অথচ উপকারী অনুজীবসমূহ দ্বারা তা substrates হিসেবে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এরা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদেরকে প্রতিহত করে পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করে।

জৈব পোল্ট্রি প্রোডাক্ট এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত পোল্ট্রি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে খাদ্য-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটা সমস্যা উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করে কারণ তা খাদ্যবাহিত রোগজীবাণু যেমন সালমোনেলা, ক্যামপাইলোব্যাক্টার এবং ই-কোলাই দ্বারা দূষিত হতে পারে। জৈব পোল্ট্রি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে লেয়ারদের ক্ষেত্রে পালক ঠুকরে খাওয়া (feather pecking) এবং একে অন্যের মাংস ভক্ষণ (cannibalism)। এছাড়াও রয়েছে পরজীবীর সংক্রমণ সমস্যা। পালক ঠুকরে খাওয়া জেনিটিক এবং পারিপার্শ্বিক উভয় কারণেই ঘটতে পারে। জেনিটিক্স বিশেষজ্ঞরা যদিও পালক ঠুকরে খাওয়ার বদভ্যাস-বহির্ভূত গুণাবলীসম্পন্ন জাতের মুরগি নির্বাচনে সক্ষম হয়েছেন তথাপি পারিপার্শ্বিক প্রভাবজনিত সমস্যার বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায়নি। এটা সম্ভবত: একটি অনিয়ন্ত্রিত আচরণ।

আন্ত্রিক পরজীবি যেমন গোলকৃমির সংক্রমণ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে যেহেতু এক্ষেত্রে জৈব পদ্ধতিতে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা খুব সীমিত। তবে চারণক্ষেত্রের পরিবর্তন পরজীবীর সংক্রমণকে হ্রাস করে। সুব্যবস্থাপনা এবং পাইরেথ্রিন

প্রোডাক্টস্-এর ব্যবহারের মাধ্যমে বহিঃ পরজীবি যেমন মাইট, উকুন, ইত্যাদির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। জৈব উৎপাদনের ক্ষেত্রে রোগের জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিশেষ সহায়ক। উল্লেখ্য যে, জৈব সেলিনিয়াম রোগ প্রতিরোধ শক্তিবর্ধক এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। ভেষজ যেমন রসুন, ওরিগানো (যেমন ORIGADIAR 5% Premix) এবং রোজমেরি বিশেষভাবে উপকারী।

জৈব পোল্ট্রি খামারের জন্য যথাযথ স্যানিটারী ব্যবস্থাদি গ্রহণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পা-ডুবানো (foot bath) অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ১:৩২ ডাইলিউশনে ব্লিচিং পাউডার (স্টেবিলাইজড ক্লোরিণ যেমন Cyberseptic-21) ব্যবহার করতে হবে। এজন্য আয়োডিনও ব্যবহার করা যায়। পানির লাইনসমূহ জৈব এসিড যেমন ভিনেগার ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (যেমন Cyberseptic-21) ব্যবহার করতে হবে। এজন্য আয়োডিনও ব্যবহার করা যায়। পানির লাইনসমূহ জৈব এসিড যেমন ভিনিগার ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (যেমন HYPEROX) দ্বারা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিন ধাপে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- যে কোন এসিড দ্বারা পানির লাইন ও নিপল থেকে ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- ফ্লাশিং এর মাধ্যমে এসব ময়লা বের করে দিতে হবে।
- স্যানিটাইজার অথবা জীবাণুনাশক যেমন ক্লোরিণ ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম প্রতিরোধ করতে হবে।

পানিতে ক্লোরিন সংমিশ্রণ করতে হবে তবে তা কেবলমাত্র পানযোগ্য পানির মাত্রানুযায়ী।

খামারের নির্মাণ শৈলী ও ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যেন কোন ইঁদুর জাতীয় প্রাণী সেখানে প্রবেশ করতে না পারে কারণ এরা নানা জাতীয় রোগ বিস্তার করে। এ জাতীয় প্রাণী নিধনের জন্য ফাঁদ অথবা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘাস ছেঁটে ছোট রাখতে হবে এবং উচ্ছিস্ট খাদ্য দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

জৈব পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যের আফলাটক্সিন পরীক্ষাকরণ। এই মাত্রা অবশ্যই ২০ পিপিবি এর নীচে থাকতে হবে। মুরগিদের রক্ত নিয়মিতভাবে রোগ নির্ণয় গবেষণাগারে পাঠিয়ে এদের স্বাস্থ্যগত সার্বিক অবস্থার বিষয়ে ওয়াকিরহাল হতে হবে। উল্লেখ্য যে, ব্রয়লারের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৫% এর কম হতে হবে। জৈব পোল্ট্রি উৎপাদকগণকে একজন পোল্ট্রি ভেটেরিনারিয়ানের সাথে সর্বদা সম্পর্ক রাখতে হবে যিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

উপসংহার: জৈব পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যবস্থা আগামী দিনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে অনেক সম্ভাবনা ও আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করবে। পরিবেশগত সমস্যা যেখানে ক্রমশ: জটিলতর হচ্ছে সেখানে এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদিও এখানে কেবলমাত্র জৈব পোল্ট্রি উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলীর বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তথাপি বিষটির গুরুত্ব অনুযায়ী তা অন্যান্য প্রাণীজ মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদন কৌশল

বাংলাদেশে ব্রয়লার মুরগির মাংসসহ গো-মাংস এবং অন্যান্য মাংসের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মেধা ও শারীরিক গঠনের জন্য দৈনিক ১২০ গ্রাম প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাজারে অনেক মাংস উপস্থিত থাকলেও শিক্ষিত সচেতন নাগরিক মানব স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মাংসের সন্ধান করেন। কারণ সবাই সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী হতে চান। একটি সুস্থ-সবল, মেধাবী জাতি ছাড়া শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছেই পোল্ট্রি মাংস গ্রহণযোগ্য। উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের কারণে মানুষ গো-মাংস কম গ্রহণ করে। ব্রয়লার সহজলভ্য ও সর্বত্রই পাওয়া যায়। মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণও সহজ। আগামীতে পোল্ট্রি মাংসই প্রোটিনের চাহিদা পূরণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে। পশুপাখির রোগের কারণে বর্তমানে মানুষ মাংস গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করছে। আগামীতে মাংস উৎপাদনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিতে পারে জুনোটিক রোগসমূহ

যেমন এভিয়ান ফ্লু, ম্যাড কাউ, ক্ষুরারোগ, তড়কা, ইত্যাদি। এছাড়াও অপ্রত্যাশিত কারণ যেমন মাংসে ডাইঅক্সিন অথবা এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি ইত্যাদি কারণে মানুষ মাংস গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষের মত ছোট বড় মুরগির খামার রয়েছে। এ সকল খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান কেমন তা মূল্যায়ন করার সময় এসে গেছে। পরিকল্পনা ছাড়া যেখানে সেখানে গড়ে উঠেছে পোল্ট্রি খামার। প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে খামারসমূহ। মানসম্মত বাচ্চার অভাব, বাসস্থান স্বাস্থ্যসম্মত নয়, ত্রুটিপূর্ণ রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সঠিক জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। ফলে ব্রয়লার মুরগির ওজন বৃদ্ধি হয় না এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এতে করে চাষীরা বাধ্য হয়ে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন। খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার গ্রোথ প্রোমোটর ব্যবহার করেন। এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রদানের ফলে রোগ জীবাণু ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ মুরগির শরীরে থেকে যায় যা খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে আসে। কিন্তু ভোক্তাদের দাবী নিরাপদ মাংস। ব্রয়লার উৎপাদনে খামারীরা পালন ব্যবস্থাপনায় নিম্নে বর্ণিত ৫+৫ = ১০ টি বিষয় মেনে চললেই নিরাপদ মাংস উৎপাদন সম্ভব হবে।

জীবাণুমুক্ত নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদন ৫টি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

১। মুরগির খামারকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে সুরক্ষা করা। খামারের চতুর্দিকে ২ মিটার দূর দিয়ে বেষ্ঠনী/বেড়া দিতে হবে। এই বেষ্ঠনীকে পেরিমিটার ফেন্সিং বলে। বেষ্ঠনী নির্মাণ করলে অনাহুত পশুপাখি খামারের আশেপাশে আসতে পারবে না। অবাঞ্চিত পশুপাখি রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। পৃথকীকরণ ব্যবস্থা না থাকলে খামারে রোগব্যাধী লেগেই থাকে, যে কারণে ঔষধ খরচ বেড়ে যায় এবং মুরগির ওজন আশানুরূপ হয় না। খামারে কোন যানবাহন প্রবেশের পূর্বে চাকা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে দিতে হবে। খামারে প্রবেশের জন্য নির্ধারিত পোশাক, জুতা, গ্লাভস এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। খামারের প্রবেশ মুখে ফুটবাথ থাকতে হবে এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। খামারে প্রবেশ সীমিতকরণ বিষয়ে সাইনবোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

২। নিরাপদ উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করা। নির্ভরযোগ্য উৎস এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলার থেকে একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা, খাদ্য ঔষধ ও ভিটামিন সংগ্রহ করতে হবে। খাদ্য ক্রয়ের সময় বস্তার গায়ে পুষ্টিমানের বিবরণ দেখে নিতে হবে।

৩। উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম অনুসরণ করা। রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে। অল-ইন-অল আউট পদ্ধতি অনুসরণ করা। ধারণ ক্ষমতার বেশি মুরগির বাচ্চা উঠানো যাবে না। অসুস্থ মুরগি আলাদা রাখতে হবে। মৃত মুরগির যথাযথ সৎকার করতে হবে।

৪। উত্তম ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থবিধি অনুশীলন করা। খামারে কাজ করার পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। পায়খানা ব্যবহার করার পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। পায়খানা ব্যবহার করার পরও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। খামারে কাজ করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যেমন গামবুট, গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। যে সব কর্মী অসুস্থ অথবা হাতে কাটা, ক্ষত বা ঘা রয়েছে তাদেরকে দিয়ে কাজা করানো যাবে না। উত্তম স্বাস্থ্য বিধি অনুশীলনে মানুষ থেকে মুরগিতে বা মুরগি থেকে মানুষে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে না।

৫। উত্তম বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পালন করা। মৃত মুরগি যেখানে সেখানে না ফেলে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে। প্রতিদিন খামারের বর্জ্য পরিষ্কার করতে হবে। খামারে পাশে ময়লা জমিয়ে রাখা যাবে না। খামার অবর্জনা ও আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ইঁদুর দমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। খামারের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভাল ড্রেনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পোল্ট্রি লিটার বা বিষ্ঠা দিয়ে জৈবসার তৈরি করে খামার বর্জ্য সম্পদে পরিণত করা দরকার।

রাসায়নিক দুষণমুক্ত নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদনে ৫টি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

১। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত মানসম্পন্ন খাদ্য ক্রয় করা। নির্ভরযোগ্য উৎস এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলার থেকে মুরগির খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। ক্ষতিকর রাসায়নিক খাদ্যে আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য গবেষণাগারে খাদ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রাসায়নিক দ্রব্য মুরগির মাংস ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জমা থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

২। ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত মানসম্পন্ন ভিটামিন ও মিনারেল ক্রয় করা। নির্ভরযোগ্য উৎস ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলার

থেকে ভিটামিন, মিনারেলস ও ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে। ঔষধের মেয়াদ দেখে নিতে হবে। প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন মিনারেল ব্যবহার করা উচিত। নিম্নমানের ভিটামিন মিনারেল ব্যবহার করলে মুরগির ওজন হ্রাসসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

৩। ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা। পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য যেমন আর্সেনিক, আয়রন, ইত্যাদি ধাতুর উপস্থিতি ক্ষতিকর। তাই বৎসরে একবার পানি পরীক্ষা করা দরকার। প্রতিমাসে ২ বার ব্লিচিং পাউডার দ্বরা পানির ট্যাংক পরিষ্কার করতে হবে। পানি কীটনাশক দ্বারাও দূষিত হতে পারে। সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না। অপ্রোয়জনীয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার এড়াতে প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শে সঠিক মাত্রা ও প্রত্যাহার সময়সীমা মেনে চললে মুরগির মাংস সম্পূর্ণরূপে এন্টিবায়োটিক এবং রেসিডিউ মুক্ত না হলেও সহনশীল মাত্রায় কমে আসে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিমুক্ত। উত্তম ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির বিকল্প হিসেবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না।

৫। খাদ্য, ঔষধ ও পানিকে ঝুঁকিমুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। খাবারের বাহিরে আলাদা জায়গায় খাদ্য ও ঔষধ মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে বিরূপ আবহাওয়া, রাসায়নিক (লুব্রিকেন্ট বা কীটনাশক) এবং পরিবেশগত দূষণ থেকে সুরক্ষা করা যায়। ফিডার ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

সর্বোপরি পোল্ট্রি ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা উন্নয়ন করতে হবে। আমরা যদি মানসম্মত পোল্ট্রি উৎপাদন করতে পারি তাহলে পোষাক শিল্পের মত পোল্ট্রি শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বায়োসিকিউরিটি

'বায়োসিকিউরিটি' কথাটি ইদানিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচিত হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত ও অপ্রয়োজনীয় লোকজনের খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। যেসব ব্যক্তিদের নিজস্ব পোল্ট্রি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ আইন আরো কঠোরভাবে প্রযোজ্য। এছাড়াও জীব-জন্তুদের প্রবেশও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ইঁদুর, বন্যপাখি, কীটপতঙ্গ এবং নিশাচর জীবজন্তুদের অনুপ্রবেশ রোধ অতীব জরুরি কারণ এদের মাধ্যমে নানাজাতীয় রোগের বিস্তার ঘটে থাকে। সুতরাং এ জাতীয় বহিরাগত জীবজন্তু থেকে খামারকে সদাসর্বদা প্রতিরক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে রোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। মানুষ এক খামার থেকে অন্য খামারে রোগ বিস্তার করতে পারে একথা আমরা জানি তবে নিশাচর বন্য জীবজন্তুকে যেহেতু সাধারণত দেখা যায় না সেহেতু তাদের দ্বারা রোগ বিস্তার অনেক বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং খামারে যেন রোগ জীবাণু বিস্তারকারী এ জাতীয় জীব প্রবেশ করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সদা সতর্ক থাকতে হবে।

চিত্রঃ পোল্ট্রি খামারে রোগব্যাধির বিস্তার।

সঠিক পরিবেশ বজায় রাখা: ছোট বাচ্চা ও মুরগির জন্য সঠিক তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত মুক্ত বাতাস, পরিস্কার খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে রোগের প্রতি মুরগির সংবেদনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বেশি ঠান্ডা অথবা বেশি উষ্ণ পরিবেশে মুরগি, বিশেষ করে এমোনিয়াপূর্ণ বদ্ধ বাতাসে থাকলে নিশ্চিতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। লিটারের তাপমাত্রা হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেখানে বাচ্চা/মুরগি রাখার পর এরা যেন সাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং দ্রুত খাদ্য খাওয়া ও পানি পান শুরু করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে এদের ইমিউন সিস্টেম সুদৃঢ় ভাবে গড়ে উঠতে উদ্দীপিত হবে। যেসব খামারে বাচ্চাদের প্রথম সপ্তাহে ক্রমাগতভাবে উৎকর্ষতার সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় সেখানে ব্রুডিং এরিয়া নিরীক্ষণ করলে উপকার পাওয়া যায়। এই নিরীক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করতে হবে।

- সেখানে কি পর্যাপ্ত হিটার আছে? প্রতি হিটারের জন্য বাচ্চার সংখ্যা কি অত্যন্ত বেশি?
- পর্যাপ্ত সময়ের জন্য কি বাচ্চারার ব্রুডিং-এর সুবিধা ভোগ করতে পারছে?
- ড্রিংকারের সংখ্যা কত? কার্যকর ড্রিংকারের সংখ্যা কি পর্যাপ্ত রয়েছে যাতে বাচ্চারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পান করতে পারে?
- ড্রিংকারের শ্রেণী কী ধরনের? ছোট বাচ্চারা কি এসব ড্রিংকার থেকে সহজে পানি পানি করতে পারে?
- ফিডার সিস্টেম কেমন? ব্রুডিং এরিয়া পরিত্যাগ না করে কি বাচ্চারা সহজে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে?
- এসব প্রশ্নের উত্তর কাগজে লিখে আদর্শ খামারী কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির সাথে তুলনা করলে ভূল ত্রুটি খুঁজে বের করা যাবে এবং তা সংশোধন করা সম্ভব হবে।

খামারে মুরগি আনার পূর্বে খামারীদেরকে আর একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা হচ্ছে পানির লাইন ফ্লাশ (flush) করা। মুরগির জীববনযাত্রা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে আদর্শভাবে শুরুর জন্য এটা বিশেষ দরকার। এই ব্যবস্থার ফলে অনুজীব দ্বারা দূষণের ঝুঁকি হ্রাস পাবে কারণ উষ্ণ ও বদ্ধ পানিতে অনুজীবের বিস্তার ঘটে বেশি। পানি স্যানিটেশনের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং তা কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। স্যানিটেশন কর্মসূচি পালিত হলেও খামারের পানির লাইনের শেষ প্রান্তে পানির গুণগতমান কেমন আছে তা পরীক্ষা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞ খামারীগণ বিশেষ করে যদি তাঁদের খামার শহরের পানি সরবরাহ লাইনের মেষ প্রান্তে অবস্থিত হয় তাহলে তাঁরা এ পানির ক্লোরিন দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করেন। অনেক খামারী তাঁদের খামারের মুরগির আশানুরূপ উৎকর্ষতা অর্জন না করতে পারার কারণ উদঘাটন করতে পারেন না; অথচ যদি তাঁরা তাঁদের খামারে পানি স্যানিটেশনের কর্মসূচি সঠিকভাবে প্রতিপালন করেন তাহলে এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয় না। এ জাতীয় সমস্যা-গ্রস্থ খামারীদের খামারের পানি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাতে প্রচুর পরিমাণে দূষিত পদার্থ রয়েছে। নিয়মিত পানি স্যানিটেশনের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় হতে পারে কিন্তু তার প্রতিদানে খামারের উৎকর্ষতা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং খামারী আর্থিক দিক থেকে অনেক লাভবান হন।

মুরগির স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে স্বাস্থ্যসম্মত লিটার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। লিটার যদি ভিজা বা স্যাঁতসেতে থাকে তাহলে তা থেকে মুরগির শুধু যে ঠান্ডাই লাগে তা নয় বরং ভিজা লিটারের ফলে নানা জাতীয় রোগ জীবাণু যেমন ই কোলাই, ওসিস্ট (যা থেকে ককসিডিওসিস রোগ হয়), সালমোনেলা ও অন্যান্য জীবাণুর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এছাড়াও ভিজা লিটার থেকে এমোনিয়া গ্যাসের উৎপত্তি হয় যা মুরগির শ্বাসনালীকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এবং এর ফলে মুরগি ব্রংকাইটিস-এর ন্যায় রোগে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। আর্দ্রতার (moisture) মাত্রা ১৫ থেকে ২৫% মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। মুরগির স্বাস্থ্য সমুন্নত রাখার জন্য যথাযথ ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে লিটারের আর্দ্রতা সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

স্যানিটেশন: দুই ঝাঁক মুরগির মাঝের বিরতিকালে লিটারসহ মুরগির ঘরের সর্বত্র স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এ সময়ে ঘর এমনভাবে পরিষ্কার করতে হবে যেন লিটারের আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি না পায়। অনেক খামারী এ সময়ে ফ্যান, ব্রুডার ও অন্যান্য সকল সরঞ্জামাদি ধৌত করেন। এ ধরনের ওয়েট ক্লিনিং (wet cleaning) ব্যবস্থা যদি গৃহীত হয় তাহলে তা মুরগি অপসারণের পর যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে যাতে লিটার সম্পূর্ণভাবে শুকানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। এর বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ড্রাই ক্লিনিং (dry cleaning) যার মাধ্যমে বাতাসের প্রেসারের সাহায্যে সরঞ্জামাদি

পরিষ্কার করা হয়। কাদা অথবা ভিজা লিটারের তুলনায় শুকনো ধূলাতে রোগ জীবাণু বৃদ্ধি পায় ধীর গতিতে। দুই ঝাঁক মুরগির মাঝের বিরতিকাল ন্যূনপক্ষে ১৪ দিন হওয়া বিশেষ জরুরি। এ ব্যবস্থা গৃহীত হলে ঘরে রোগজীবাণুর উপস্থিতি কম হবে এবং পরবর্তী ঝাঁক যখন আনা হবে তখন এ অবস্থা তাদের স্বাস্থ্যে জন্য অনুকূলে হবে। যেসব খামারীরা সব কিছু পরিষ্কার করেন তাঁদের উচিত মেঝেতে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। নতুন লিটার স্থাপনের পূর্বে কার্যকরভাবে জীবাণু ধ্বংসের জন্য মেঝেকে সম্পূর্ণরূপে শুকাতে হবে। জৈব পদার্থ যতো বেশি থাকবে, জীবাণুনাশক দ্বারা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ঈস্ট ও মোল্ড নিধনের কার্যকারিতা ততোই হ্রাস পাবে। বিশেষ করে ঘরের বহির্গমনের দরজা সংলগ্ন এলাকার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ এই এলাকাতে পুরাতন লিটার ও কাদার পরিমাণ বেশি থাকতে পারে।

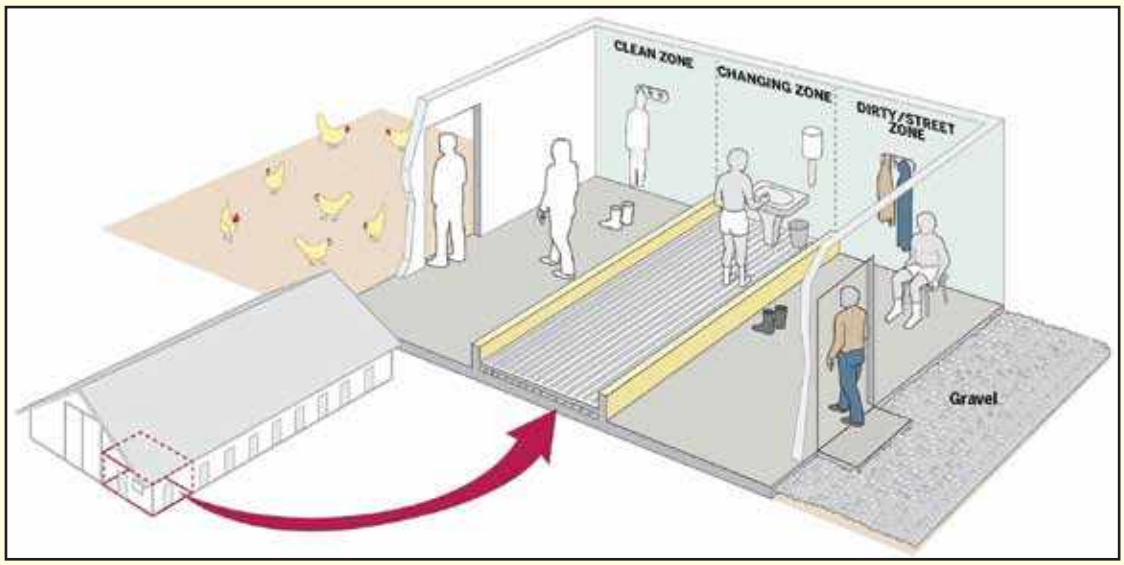

চিত্রঃ খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

সংক্ষিপ্তসার

এন্টিবায়োটিকস্ গ্রোথ প্রমোটার ব্যবহার ছাড়া পোল্ট্রি উৎপাদনের প্রচেষ্টা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ, কঠিন এবং অলাভজনক প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হলেও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়াদির গুরুত্ব অনুধাবন করে তা ব্যবহার যতদূর সম্ভব সীমিত করা আবশ্যক। সঠিক পরিকল্পনা, সুব্যবস্থাপনা, রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে সদা সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কঠোরভাবে বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা প্রতিপালন ও সংশ্লিষ্ট আরো বিষয়াদির ব্যাপারে সজাগ থাকলে খামারে রোগ-ব্যাধির অনুপ্রবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং এর ফলে এন্টিবায়োটিকস্-এর ব্যবহারও সীমিত করা যায়। এজন্য রোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে যে সমস্ত কার্যকর ব্যবস্থাদি কঠোরভাবে প্রতিপালন করা উচিত তা হচ্ছে :

- মানুষ ও জীবজন্তুর অনুপ্রবেশ প্রতিরোধকল্পে কঠোর বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থ অনুসরণ।
- মুরগি সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা ও সবল ইমিউন সিস্টেম গড়ে তোলার জন্য যথার্থ পরিবেশ বজায় রাখা। এজন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক তা হচ্ছে;
  - সদ্য আনীত বাচ্চা ও মুরগির জন্য ঘরের তাপমাত্রা সঠিক রাখা।
  - পর্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থাকরণ।
  - পরিষ্কার সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং তা যেন সকলে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- দুই ঝাঁক মুরগির মাঝের বিরতিকালে স্যানিটেশন কার্যক্রম যথাযথভাবে গ্রহণ।

পাঠ - ৭
পশুপাখি হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং এক স্বাস্থ্য নীতির প্রয়োগ

গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি

পর্যাপ্ত পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বজায় রাখার পর দেহ স্বাভাবিক কার্যসম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে সে অবস্থাকে রোগ বলে। এছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন সিস্টেম বা কার্যসম্পাদনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হলে সে অবস্থাকেও রোগ বলা হয়। মানুষের মধ্যে রোগ যেমন মহামারী আকার ধারণ করে অনুরূপ গবাদিপশুর বেলাও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে মানুষ ও গবাদিপশুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ তার অসুস্থতা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু গবাদিপশু তা পারে না। তাই গবাদিপশুর রোগব্যাধির ব্যবস্থাপনা যে দুরূহ ব্যাপার তা বলাই বাহুল্য। রোগের কারণ অনুযায়ী গবাদিপশুর রোগব্যাধিকে সাধারণত নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

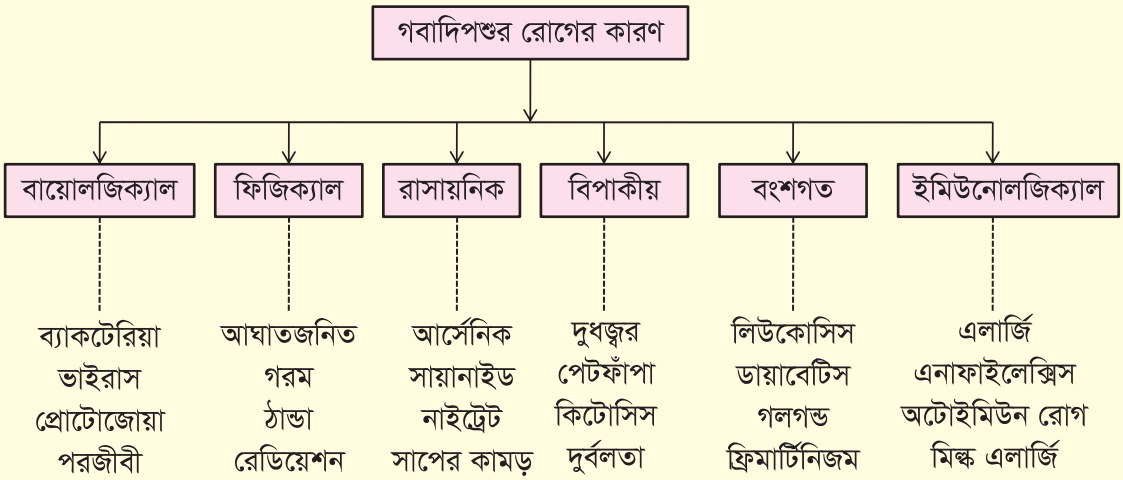

চিত্রঃ গবাদিপশুর রোগের প্রকারভেদের প্রবাহ চিত্র।

(১) বায়োলজিক্যাল বা জীবাণুঘটিত রোগ: এ সকল রোগে নির্দিষ্ট রোগ জীবাণু সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে বলে এদেরকে সংক্রামক রোগ বলে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ	ভাইরাসঘটিত রোগ	প্রোটোজোয়াজনিত রোগ	ছত্রাকজনিত রোগ	পরজীবিজনিত রোগ
তড়কা বা এনথ্রাক্স	ক্ষুরারোগ বা এফএমডি	ট্রাইকোমোনিয়াসিস	রিংওয়ার্ম বা দাদরোগ	কলিজা কৃমি
বাদলা	জলাতংক বা র‍্যাবিস	ব্যাবেসিওসিস	এসপারজিলোসিস	গোল কৃমি
গলাফুলা	বোভাইন এফিমেরাল ফিভার	ককসিডিওসিস	একটিনোব্যাসিলোসিস	ফিতা কৃমি
ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস	বোভাইন ভাইরাল ডাইরিয়া	ব্যালানটিডিওসিস	একটিনোমাইকোসিস	কেঁচো কৃমি বা এসকারিয়াসিস
ব্রুসেলোসিস	পিপিআর বা ছাগ বসন্ত			ফুসফুসের কৃমি
কলিব্যাসিলোসিস	রিন্ডারপেষ্ট বা গো-বসন্ত			আঠালি, উকুন
টিউবারকুলোসিস বা যক্ষা	প্যারাপক্স			

বিভিন্ন মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। কতিপয় মাধ্যম (ফাত্তাহ ২০০০) নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) সংক্রামক: তড়কা, বাদলা, ক্ষুরারোগ, আমাশয়, ব্যাবেসিওসিস ইত্যাদি।
- o বাতাসের মাধ্যমে- ক্ষুরারোগ, পিপিআর, বসন্ত ইত্যাদি।
- o পানির মাধ্যমে- কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি।
- o সংস্পর্শে- তড়কা, ক্ষুরারোগ, র‍্যাবিস ইত্যাদি।
- o মাটির মাধ্যমে- তড়কা, বাদলা ইত্যাদি।
- o দূষিত খাদ্যের মাধ্যমে- বটুলিজম, আমাশয়, পেটের পীড়া, পেটব্যাথা ইত্যাদি।
- o মশামাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ- ম্যালেরিয়া, হাম্পসোর, ব্যাবেসিওসিস ইত্যাদি।

(২) ফিজিক্যাল: আঘাতজনিত, গরম, ঠান্ডা, রেডিয়েশন ইত্যাদি।
(৩) রাসায়নিক: বিষ দ্বারা সৃষ্ট রোগ যেমন লেড, আর্সেনিক, সায়ানাইড, নাইট্রেট, সাপের কামড় ইত্যাদি।
(৪) বিপাকীয় ও অপুষ্টিজনিত: দুধজ্বর, পেটফাঁপা, কিটোসিস, দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, রাতকানা ইত্যাদি।
(৫) বংশগত ও জন্মগত কারণ: লিউকোসিস, ডায়াবেটিস, গলগন্ড, ফ্রিমার্টিনিজম ইত্যাদি।
(৬) ইমিউনোলজিক্যাল: এলার্জি, এনাফাইলেক্সিস, অটোইমিউন রোগ, মিল্ক এলার্জি ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ বাংলাদেশে একটি অন্যতম প্রধান ক্ষতিকারক রোগ যার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া গরীব-ধনী কৃষকের জীবনে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। তাছাড়া বাংলাদেশের গবাদিপশুতে প্যারাপক্স ভাইরাসের সংক্রমণ সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে (Lederman et al. 2014) এবং ধারণা করা হচ্ছে যে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ও দমনের মৌলিক উপায়সমূহ

পশুপাখির খামারে রোগ প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ-

সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে: যে কোন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ রোগ প্রতিরোধ (prevention) ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এজন্য দুগ্ধ খামার মালিকদেরকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

কোয়ারেন্টাইন (quarantine) বা সঙ্গনিরোধ: সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-
- o সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত সুস্থ পশু থেকে দ্রুত আলাদা করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে যতদিন না ঐ রোগ অন্য পশুকে সংক্রমনের আশঙ্কামুক্ত হয়।
- o নতুন ক্রয় করা বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত প্রাণিকে এনেই খামারের অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। তিন সপ্তাহ সময় সেগুলোকে পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রাণির কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবেই খামারের পুরানো প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে।
- o বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশের সময় পা জুতার তলা জীবাণুনাশক পদার্থ গুলানো পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে।
- o যে সকল সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে নিয়ম মতো দিতে হবে। নিজের খামারে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী খামার বা প্রাণী সমূহকেও একই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- o প্রাণির খাদ্য টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিজ খামারেই মিশ্রিত করতে হবে।
- o কোন এলাকাতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সে এলাকার পশুপাখি বা পশুপাখিজাত দ্রব্যাদি হাটে বাজারে বা ঐ এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- o খামারে বন্য জন্তু প্রবেশ ও চলাচল বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মশা-মাছি, ইঁদুর ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।
- o খামারের রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে হবে। ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তা জবাই করে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের ব্যবস্থামতে মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে প্রাণির মরদেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

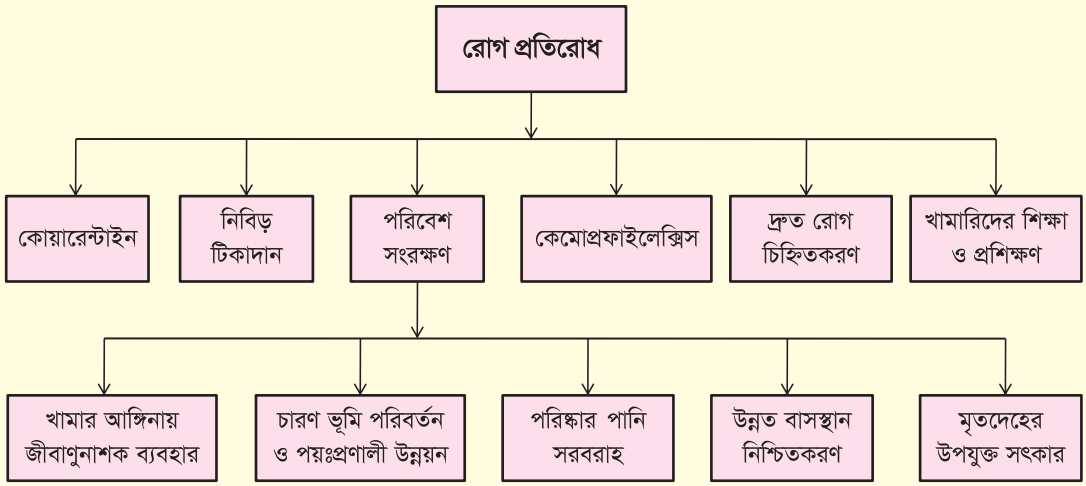

চিত্রঃ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রবাহ চার্ট।

নিবিড় টিকা প্রদান (mass immunization): কোন নির্দিষ্ট সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে সকল বয়সের পশুপাখিকে নিবিড়ভাবে টিকা প্রদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা হয়।

কেমোপ্রফাইলেক্সিস (chemoprophylaxis): গবাদিপশুর পানি ও খাবারে প্রতিষেধক মাত্রায় এন্টিবায়োটিক, সালফোনামাইড এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণের (environmental measures) ব্যবস্থা:

- খামার আঙ্গিনায় জীবাণুনাশক ছিঁটিয়ে পরিষ্কার করা- খামার আঙ্গিনা পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক (আয়োসান, ডেটল, স্যাভলন, টিমসেন, সুপারসেপ্ট) ছিঁটিয়ে বিভিন্ন রোগের জীবাণু বিস্তার রোধ ও ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ করা হয়।
- চারণ ভূমি পরিবর্তন ও পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন- নির্দিষ্ট সময় পর পর চারণভূমির পরিবর্তন করে কৃমি এবং ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধের একটি ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাযুক্ত উন্নত নর্দমা এবং ভাল পানির ব্যবস্থাযুক্ত চারণভূমি ব্যবহার করা।
- পরিষ্কার পানি সরবরাহ- গবাদিপশুকে সব সময় পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা উচিত। কোন অবস্থাতেই ডোবা বা নর্দমার পানি খেতে দেয়া উচিত নয়।
- উন্নত বাসস্থান- গবাদিপশুকে অতিরিক্ত রৌদ্র, গরম, ঠান্ডা, ঝড়-বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য উন্নত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকার- সংক্রামক রোগে মৃত গবাদিপশুকে খোলা মাঠে বা পানিতে ভাসিয়ে দেয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে মৃত গবাদিপশুর দেহ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা অথবা ভালভাবে পুড়িয়ে ফেলানো উচিত।

দ্রুত রোগ চিহ্নিতকরণ: রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন- টিউবারকুলিন পরীক্ষায় টিবি, এসলুটিনেশন পরীক্ষায় ব্রুসেলোসিস, ফিজিক্যাল এবং কেমিকেল পরীক্ষায় উলান ফোলা রোগ নির্ণয় করা যায়।

খামারিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, টিকা প্রদান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

গবাদিপশু হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরূপ রোগ

যে সকল রোগ পশুপাখি থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে পশুপাখিতে সংক্রমিত হয় তাদেরকে জুনোটিক রোগ বলা হয়।

এ সকল রোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত প্রাণিকে main host বা natural host বলে এবং পরোক্ষভাবে আক্রান্ত প্রাণিকে intermediate host বা reservoir বলে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জুনোটিক রোগ এবং তাদের ব্যবস্থাপনায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হয়েছে (Samad 2011, Islam 2014)। তবে সার্বিকভাবে নিম্নবর্ণিত জুনোটিক রোগগুলোর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগটি জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক।

ব্যাকটেরিয়াজনিত	ভাইরাসজনিত	পরজীবিজনিত
তড়কা (Anthrax)	জলাতংক (Rabies)	টিনিয়াসিস (Tania solium)
যক্ষা (Tuberculosis)	ম্যাড কাউ	মেঞ্জ (Mange)
ধনুষ্টংকার	সার্স (SARS)	ট্রাইকোমোনিয়াসিস
ব্রুসেলোসিস (Brucellosis)	মানকি পক্স	টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasma gondi)
ভিব্রিওসিস	প্যারাপক্স	হুক ওয়ার্ম (Aneylostoma aninum)
সালমোনেলোসিস		

*সম্প্রতি বাংলাদেশের গবাদিপশুতে parapoxvirus নামক জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে (Lederman et al. 2014)।

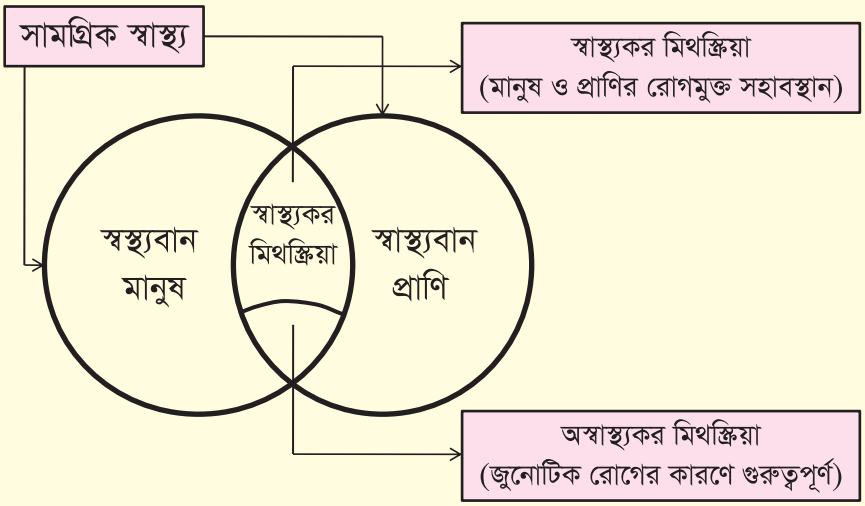

চিত্রঃ জুনোটিক রোগের ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রাণির মিথস্ক্রিয়া।

এক স্বাস্থ্য এক বিশ্ব এক ঔষধ এক ভালবাসা

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের একটি প্রধান বাধা হচ্ছে রোগব্যাধি। এ রোগব্যাধিগুলো বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ। উন্নত বিশ্বে এসব রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা অনেকটা সম্ভব হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো তা থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এ পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যনীতি ব্যবস্থা। সেজন্য দরকার একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যেখানে প্রাণীর বিভিন্ন রোগ, রোগের কারণ, বিস্তারের কৌশল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে মানুষের চিকিৎসকদের জ্ঞান থাকবে, ঠিক সে রকমই প্রাণিচিকিৎসক ও পরিবেশ এবং জীববিজ্ঞানীদেরও তাদের বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান থাকবে। আমাদের দেশেও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। উদাহরণ স্বরূপ One World One Health-Bangladesh Initiative (One Health Bangladesh) 'এক স্বাস্থ্যের' ধারণাটি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সরকারি ও বেসরকারি শাখার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এক স্বাস্থ্যের সুযোগগুলো মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রসার ঘটানো।

২১তম শতাব্দীর সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে 'এক স্বাস্থ্যের' synergism (একজন ছাড়া দু'জনে একই কাজ করলে কাজের পরিমাণটা তাদের ব্যক্তিগত কাজের সমষ্টির চেয়ে বেশি হয়) অর্জন করা সম্ভব। এ ছাড়াও বায়োমেডিক্যাল গবেষণায় অধিকতর আবিষ্কার, জনস্বাস্থ্যের কর্মদক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ত্বরিত বিস্তার, মেডিক্যাল শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সঠিক ক্লিনিক্যাল পরিচর্যার মাধ্যমে একে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব। যখনই একে (এক স্বাস্থ্য) নির্ভুলভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তখনই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের অগণিত জীবন রক্ষা করা সম্ভবপর হবে। 'এক স্বাস্থ্য' সম্পর্কে অনেক ধারণা প্রচলিত থাকলেও এর মূল বিষয়বস্তুটি হলো দীর্ঘ কাল্পনিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটি সঠিক পদক্ষেপকে কার্যে পরিণত করা। তথাপি বাস্তবতা সত্ত্বেও পুন:পুন: অনেকগুলো প্রমাণ/সাক্ষ্য ইঙ্গিত করে যে, ক্লিনিক্যাল গবেষণাগারগুলো বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে যা মানুষ ও প্রাণীর ঔষধকে একটা লাইনে দাঁড় করাচ্ছে যা প্রকারান্তরে 'এক স্বাস্থ্য' কে সমর্থন করে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবিদ জ্ঞানত স্বীকার করেন যে, 'এক স্বাস্থ্যের' মৌলিক জ্ঞান রীতিটি ঔষধ কেন্দ্রিক। প্রকৃতির বিশ্ব ও জীবনের মূল ভিত্তি/গঠন হচ্ছে একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা। দুর্ভাগ্যবশত উন্নত বিশ্বে সংক্রামক রোগ, অসংক্রামক রোগ (ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিকস ইত্যাদি) এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলেও এ নিয়ে ভেটেরিনারি ঔষধ ও মানুষের ওষুধের মধ্যে একটি দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। ভেটেরিনারি ঔষধ দ্বারা সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তথাপি সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে যতোটা জোর দেয়া সম্ভব বাস্তব ক্ষেত্রে তা অর্জিত হয়নি। বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য 'এক স্বাস্থ্য' অসংখ্য নিয়মমাফিক কার্যকর উপস্থাপনার প্রতি অনেক বেশি নির্ভরশীল। মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের অবস্থা নিশ্চিত করতে ভেটেরিনারিয়ান, বাস্তুতন্ত্রবিদ, বন্যপ্রাণীবিদ এবং গবেষক ছাড়াও অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে অবশ্যই একমত পোষণ করতে হবে।

'এক স্বাস্থ্য' নীতির লক্ষ্য / উদ্দেশ্য

- জুনোটিক ডিজিজ (যে রোগ মানুষ থেকে প্রাণী বা প্রাণী থেকে মানুষে বিস্তারলাভ করে), কৃষি সমস্যা, সংক্রামক রোগের ফলে সামাজিক অবক্ষয়, বায়োটেররিজম, বৈশ্বিক পণ্য ও মানুষ, জলবায়ুর পরিবর্তন, ইত্যাদি।
- পারস্পরিক পেশাগত সহযোগিতা, স্বাস্থ্য বিদ্যার শিক্ষাগত সযোগ-সুবিধা এবং তাঁদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো One Health Commission (প্রতিষ্ঠা-২০০৯) কে ফোকাস (কেন্দ্রীভূত) করে।
- 'এক স্বাস্থ্য নীতি মিশনের' মতে, মানবস্বাস্থ্য, প্রাণীস্বাস্থ্য ও বাস্তুসংস্থানের পরিবেশ একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল।
- ভেটেরিনারিয়ান, চিকিৎসক ও অন্যান্য পেশাজীবীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি করা সম্ভব যা 'এক স্বাস্থ্যের' লক্ষ্য।
- এক স্বাস্থ্যের মতবাদ অনুসারে মানুষের ঔষধ, ভেটেরিনারি ঔষধ এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতি যেমন, মানব ও প্রাণীর জীবনের মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

'এক স্বাস্থ্য' নিম্নোক্ত উপায়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব

- মানুষের ঔষধ, ভেটেরিনারি ঔষধ, জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রিত হয়ে কাজ করা।
- গণমাধ্যম, কনফারেন্স ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নেটওয়ার্কগুলোকে একত্রিত হয়ে কাজ করা।
- বিভিন্ন প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার জন্য ক্লিনিক্যাল যত্নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া।
- বিভিন্ন প্রজাতির রোগ নিরীক্ষণ এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন প্রজাতির রোগের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে।
- বিভিন্ন প্রজাতির রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার জন্য রোগ নির্ণয়, ঔষধ ও টিকাদান পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করা।
- গণমাধ্যমের সহযোগীতায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতন করা।

পাঠ - ৮
প্রাণিসম্পদের রোগ নির্ণয় ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রেরণ পদ্ধতি

বর্তমানে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, গরু মোটাতাজাকরণ, ডেইরি খামার স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবক্ষেত্রে যদিও গবাদিপশু ও ডেইরি শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তথাপি এ ক্ষেত্রে বিরাজিত বিভিন্ন সমস্যাদি যেমন সদ্য প্রসূত বাছুরের ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু, গাভীর ওলান ফোলা, অকাল গর্ভপাত, পরজীবীর সংক্রমণ ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে এ শিল্পের উন্নতি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিশ্রুতির সঠিক প্রতিফলনের জন্য মান নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নাই। তাই সঠিকভাবে গবাদিপশুর রোগ নির্ণয় করে এ শিল্পের অগ্রযাত্রাকে নিষ্কন্টক রেখে ভোক্তা শ্রেণীকে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সহ বৈদেশিক মুদ্রা আহরনে মান নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। খামার বা যে কোন প্রকারের প্রাণিজ উৎসের সঠিক মান নির্ণয়ের জন্য কী নমুনা পাঠাবেন এবং কীভাবে পাঠাবেন তা বুঝতে পারাটা পূর্ব শর্ত। তাই গবাদিপশুর রোগ এবং ব্যবহৃত ঔষধের নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সঠিকভাবে নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রেরণ পদ্ধতি অনস্বীকার্য। তাই এ বিষয় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

নমুনার প্রকার এবং প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত নমুনা বলতে জৈব (biospecimen) নমুনাকেই বোঝানো হয়। গবেষণাগারের জন্য নমুনা সাধারণত যে কোন পরীক্ষা, রিসার্চ / গবেষণা বা সঠিক মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নমুনা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যথাঃ- তরল (রক্ত, প্রস্রাব, সোয়াব ইত্যাদি), অর্ধশক্ত (মল) এবং শক্ত (মাংস, যকৃত, বৃক্ক, ফুসফুস ইত্যাদি)। গবেষণাগার থেকে ভাল সেবা ও সঠিক ফলাফল পেতে হলে সঠিকভাবে নমুনা সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়াও-

- যে কোন রোগের সঠিক নির্ণয়ে
- জীবাণুর বৈশিষ্ট্য নিরূপনে
- কোন রোগের রোগতত্ব (pathogenesis) জানতে
- ঔষধের সঠিক মান যাচাইয়ে
- রোগ ও ঔষধ বিষয়ক কোন আইনের সঠিক প্রয়োগে

গবেষণাগারে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ

কারণতত্ত্বভিত্তিক পরীক্ষা (Etiology based examination)

১। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা: ক) ব্যাকটেরিওলজিক্যাল পদ্ধতি খ) ভাইরোলজিক্যাল পদ্ধতি গ) মাইকোলজিক্যাল পদ্ধতি

২। প্যারাসাইটোলজিক্যাল পরীক্ষা: ক) হেলমিন্থলজিক্যাল পদ্ধতি খ) এন্টোমোলজিক্যাল পদ্ধতি গ) প্রোটোজোলজিক্যাল পদ্ধতি

৩। ইমিউনোডায়াগনস্টিক পদ্ধতি

৪। প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা

ক) ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল পদ্ধতি- রোগাক্রান্ত পশুর রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়।

খ) পোস্ট মর্টেম বা ময়নাতদন্ত- প্রধানত রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই মৃত পশুর পোস্ট-মর্টেম করা হয়। চাক্ষুষ প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা এবং গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা মূল উদ্দেশ্য। হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য টিস্যু এবং রোগের কারণ সনাক্তকরণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে হয়।

গ) হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পদ্ধতি

মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য নমূনা সংগ্রহ পদ্ধতি

নমুনা সংগ্রহের সময় মিউকোসাল মেমব্রেন এর অংশে পুরুলেন্ট অংশ সংগ্রহ করতে হয়। ত্বকের ছত্রাকের নমুনা সংগ্রহের জন্য

৭০% এলকোহলের সাহায্যে আক্রান্ত অংশ পরিষ্কার করে নিতে হয়। ফলে নমুনায় ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারে না।
যদি ব্যাকটোলজিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল দুই পরীক্ষার নমুনা একই সাথে সংগ্রহ করতে হয় তবে প্রথমে ব্যাকটোলজিক্যাল নমুনা ও পরবর্তীতে মাইক্রোলজিক্যালের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। ভাল নমুনা সংগ্রহের স্থান হচ্ছে গভীর চামড়ার অংশ অথবা গোড়া সহ চুল। কাচি দিয়ে কাটা চুল ছত্রাক পরীক্ষার জন্য ভাল নমুনা নয়। গোবর যদি পরীক্ষা করতে হয় তবে সম্পূর্ণ গোবর নমুনা হিসেবে প্রেরণ করতে হবে।
বায়োলজিক্যাল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে জীবানুমুক্ত কোড বিহীন টিউবে ০.৫-২ মিলি নমুনা প্রয়োজন। প্রস্রাবের ক্ষেত্রে ৫ মিনিট এবং ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

ব্যাকটোলজিক্যাল জন্য নমুনা সংগ্রহ

সংগ্রহের সময়: যদি সম্ভব হয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের পূর্বে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। যদি চিকিৎসা করা হয়ে থাকে তবে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পর নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। মৃত প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে হলে পোষ্টমর্টেমের পর পরই সংগ্রহ করতে হবে।
সংগ্রহের স্থান: স্বাস্থ্যকর বা ইনফ্লামেশন হওয়া উচ্চ স্থানটির কিনারা থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয় ঐ অংশগুলোতে জীবাণু বেশি থাকে। গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পুরোল্যান্ট লিশন, ইনফ্লামেশনের ফলে পরিবতনশীল জায়গা সমূহ যেমন কান, কোচ, ইত্যাদি। তবে কোচ থেকে ব্যাকটেরিয়া জন্মানো অসম্ভব।
নমুনায়নের পদ্ধতি: যখন ব্যাকটেরিয়া জন্মানো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তখন বাড়তি কোন মিশ্রণ প্রতিরোধ করতে হবে। যেমন ময়লা বা অন্য কিছু।

ব্যাকটেরিওলোজির জন্য নমূনা প্রেরণের জন্য জ্ঞতব্য বিষয় সমূহ

- কটন দিয়ে মুছে সোয়াব সংগ্রহ করা
- যদি সম্ভব হয় সোয়াব নমুনাটি পরিবহন মিডিয়ার মাধ্যমে পাঠাতে হবে
- শুষ্ক নমুনা থেকে ব্যাকটেরিয়া কালচার করা যায় না তাই সোয়াব কে তরলে মিশিয়ে নিতে হবে
- যদি নমুনাটি পরবর্তী দিন প্রেরণ করতে হয় তবে নমুনাটি (+২° থেকে +৮°) ডিগ্রি সেলসিয়াসে পাঠাতে হবে। যদি নমুনা প্রেরণে আরও দেরি হয় তবে যথাযথ কুল চেইন মেনে ফ্রিজিং অবস্থায় পাঠাতে হবে। যদি কোন কোষের ভিতরের জীবাণু যেমন Listeria পরীক্ষা করা হয় তবে ফ্রিজিং করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পোস্ট মর্টেম বা ময়নাতদন্ত

পোস্ট মর্টেমে প্রয়োজন

- জীবাণুমুক্ত এক সেট যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যেমন- পোস্ট-মর্টেমের ছুঁরি, কাচি, হাতের গ্লাভস, এ্যাপ্রন, রাবারের জুতা মাস্ক, বালতি, স্টেনলেস ট্রে, মগ, পলিথিন কাগজ, স্পিরিট ল্যাম্প, সুতা, জীবাণুনাশক পদার্থ যেমন- ডেটল বা স্যাভলন বা স্পেনিল, মেথিলেটেড স্পিরিট, তুলা ইত্যাদি।
- নমুনা সংগ্রহের জন্য উপকরণ বিশেষ- জীবাণুমুক্ত ভায়াল, গ্লাস স্লাইড, জীবাণুমুক্ত সোয়াব, দাগ দেয়ার পেনসিল ইত্যাদি।

পোস্ট-মর্টেম পদ্ধতি

- প্রথমে মৃত দেহের ওজন, বয়স, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ, রং, চিহ্ন ও কেস নম্বর লিখে নিতে হবে।
- রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, গবেষণাগারের ডাটা, চিকিৎসা, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, মৃত ও পোস্ট-মর্টেমের মধ্যবর্তী সময়, মৃত সময়ের ভঙ্গি ইত্যাদি রিপোর্টে লিখে নিতে হবে।
- মরণ-সঙ্কোচন (rigormortis), পেট ফাঁপা, মলাশয়ের নির্গমন ও পচনজনিত গন্ধ, বাহ্যিক অঙ্গ, যৌনাঙ্গ, ওলান ও বাছুরের নাভী পরীক্ষা করতে হবে। কোন আঘাত বা থেতলানো, চর্ম রোগ, বহিঃদেহের পরজীবী, অস্থি ভঙ্গ, অস্থিসন্ধিচ্যুতি, টিউমার আছে কিনা এবং থাকলে কোথায় আছে ইত্যাদি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- চোয়ালের অস্থিসন্ধি থেকে কাটা আরম্ভ করে বস্তি শ্রোণীকোনা (pelvis) পর্যন্ত লম্বা লম্বি ভাবে চামড়া কাটতে হবে।
- পেট কেটে উদরের ভিতর সমস্ত অঙ্গের অবস্থান পরিবর্তন ও অন্ত্রচ্ছেদীয় গহ্বরের তরল পদার্থের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- বক্ষ গহ্বর উন্মুক্ত করে ফুসফুসাবরক ঝিল্লীর তরল পদার্থ, হৃৎপিন্ডের রক্ত সংগ্রহ করতে হয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করতে হয়।
- জিহ্বা বক্ষ গহ্বরের সমস্ত অঙ্গ বের করে ব্রঙ্কাই ও ফুসফুস পৃথক ভাবে পালপেশন করে অস্বাভাবিকতা গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- গলকোষ, টনসিল, খাদ্যনালী, ল্যারিঙ্কস, ট্রাকিয়া, থাইরয়েড গ্রন্থি, চোয়ালাস্থি সংক্রান্ত লসিকা গ্রন্থিগুলো পরীক্ষা করতে হয়।
- হৃৎপিন্ড গহ্বর খুল দেয়াল, কপাটিকা এবং সঙ্গের ধমনী ও শিরা লম্বালম্বিভাবে কেটে পরীক্ষা করতে হয়।
- বক্ষ গহ্বরের ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করার পর উদর গহ্বরের অঙ্গগুলো পরীক্ষা করতে হবে। প্লীহা ও অগ্নাশয় পরীক্ষা করে অস্বাভাবিকতা দেখতে হবে। যকৃতের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে পিত্তনালী লম্বালম্বিভাবে কেটে কলিজার পাতাকৃমি ও পিত্ত পাথরী আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
- বৃক্ক, বৃক্কনালী, মূত্রাশয়, মূত্রনালী এবং বিভিন্ন যৌনাঙ্গ লম্বালম্বিভাবে কেটে পরীক্ষা করতে হবে।
- মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকান্ড (spinal cord) বের করে মেরুরস পাসচার পিপেটের সাহায্যে সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকান্ত্র কেটে খুলতে হবে। যদি বিষক্রিয়ার সন্দেহ থাকে তবে পাকস্থলীর বস্তু সমুদয়ের কিছু অংশ পরিষ্কার বোতলে সংগ্রহ করতে হবে এবং পদার্থের পরিমাণ, প্রকৃতি, পরজীবীর উপস্থিতি এবং শ্লেষ্মাঝিল্লীর অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- মৃত পশুর মাংসপেশী, অস্থি, অস্থিসন্ধি এবং লসিকা গ্রন্থিসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- পোস্ট-মর্টেমে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন রিপোর্ট ফর্মে লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা উচিত।

নমুনা সংরক্ষণ ও প্রেরণের সাধারণ নির্দেশিকা

- বিষক্রিয়ায় মৃত পশু সংগৃহীত নমুনা সংরক্ষণের জন্য কোন ঔষধ (preservative) না দেয়াই ভাল। এই নমুনা ড্রাই আইসের সাহায্যে গবেষণাগারে পাঠানো প্রয়োজন।
- ব্যাকটেরিয়া স্বতন্ত্র করার জন্য সোয়াব ও টিস্যু ঠান্ডা অবস্থায় কোন প্রিজারভেটিভ না দিয়ে পাঠানো দরকার।
- ভাইরাস স্বতন্ত্রীকরণের জন্য ৫০% গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠান্ডা অবস্থায় পাঠানো যায়।
- হিস্টোপ্যাথোলোজিক্যাল পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত টিস্যুর প্রায় ১০ গুণ ১০% নিরপেক্ষ ফরমালিনে সংগ্রহ করে পাঠানো প্রয়োজন।
- নমুনা সুষ্ঠুভাবে প্যাকিং করে এবং সিলগালা লাগিয়ে গবেষণাগারের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- সিরোলজিক্যাল পরীক্ষা ও র‍্যাপিড এন্টিজেন/এন্টিবডি টেস্টের জন্য সিরিঞ্জের সাহায্যে রক্ত সিরাম বা প্লাজমা সংগ্রহ করে বরফ সহযোগে গবেষণাগারে পাঠাতে হবে।
- টিস্যু ও পরজীবী সনাক্তকরণের নমুনার জন্য ৭০-৯০% এলকোহল ব্যবহার করতে হবে।

নমুনার সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী প্রদান করতে হবে

- ময়নাতদন্তের পশুর বর্ণনাঃ প্রজাতি, জাত, বয়স, লিঙ্গ রোগের ক্লিনিক্যাল ইতিহাস ও লক্ষণ।
- রোগাক্রান্ত সময়ের মেয়াদ ও তীব্রতা এবং আক্রান্ত প্রাণীর সংখ্যা ও মৃত্যুর হার
- নমুনার প্রকৃতি ও সংগ্রহের সময় ও তারিখ। এছাড়া প্রদানকৃত চিকিৎসা ও টিকার প্রদানের বিবরণ।
- প্রেরিত নমুনায় কোনো সংরক্ষক দেয়া হয়েছে কিনা এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ফরম প্রেরণ করতে হবে।
- মালিক/প্রেরক/ভেটেরিনারিয়ানের নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর।

নমুনার প্রেরণের ব্যবস্থা।

- নমুনা প্যাকিংয়ে লেবেল- প্রেরক ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা, পশুর প্রজাতি, নমুনার প্রকৃতি এবং নমুনা সংগ্রহের সময় ও তারিখ থাকা প্রয়োজন।
- সাধারণত ডাক বিভাগ বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নমুনা পাঠানো যায়। তবে আমাদের দেশে সরাসরি লোক মারফত নমুনা পাঠানোই উত্তম ব্যবস্থা।
- নমুনা পাঠাবার ঠিকানাঃ আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার অথবা কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (CDIL), ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০।

গবেষণাগারে নমুনাভিত্তিক পরীক্ষা

রক্ত নমুনা সংগ্রহ

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য সাধারণত শিরা থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত সুস্পষ্ট শিরা থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

* রোমন্থক পশু ও ঘোড়া: জুগুলার ভেইন, লেজ/কানের ভেইন (শিরা)।
* কুকুর ও বিড়াল: সেফালিক ও স্যাফেনাস ভেইন।
* শুকর: কানের শিরা ও সরাসরি হৃৎপিন্ড থেকে।
* খরগোশ ও গিনিপিগ: কানের শিরা ও সরাসরি হৃৎপিন্ড থেকে।
* মাউস ও ইঁদুর: চোখ ও লেজের শিরা।

রোগীর প্রস্তুতিঃ সঠিক ফলাফলের পূর্বশর্তই হলো রোগীর সঠিক পূর্বপ্রস্তুতি। যদি সম্ভব হয় প্রাণিটিকে নমুনা সংগ্রহের ১২ ঘন্টা পূর্বে অভুক্ত রাখা। ফলে রক্তের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। অন্যথায় রক্তের অনেক মান দন্ডের মানই ভুল আসার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে রক্তের এমোনিয়া ও বাইল এসিড টেষ্টের ক্ষেত্রে প্রাণিকে অবশ্যই অভুক্ত রাখতে হবে। নমুনা সংগ্রহের পূর্বে ভারী শারীরিক কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি খুব দ্রুত ও সাবধানতার সাথে করতে হবে। শারীরিক ব্যায়াম রক্তের ক্রিয়েটিনিন, ল্যাকটেট ডিহাড্রোজিনেজ, ল্যাকটেট, গ্লুকোজ এবং কর্টিসোল এর মাত্রাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে চলমান লিম্ফোসাইটের মাত্রা বেড়ে যাবে।

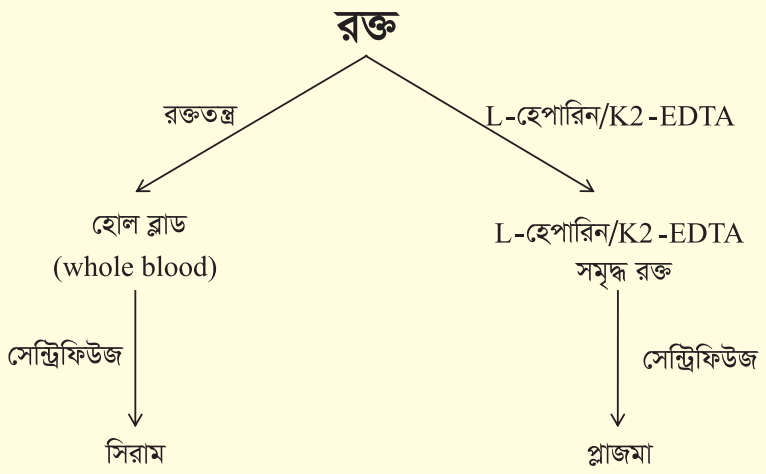

চিত্রঃ রক্তের নমুনা সংগ্রহ।

রক্তের নমুনা সংগ্রহের কৌশলঃ রক্তের হিমোলাইসিস প্রতিরোধের জন্য রক্ত সংগ্রহের জন্য শিরাকে উচু করার পরপরই দ্রুত রক্ত সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সিরিঞ্জকে নেতিবাচক চাপ/ নেগেটিভ চাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে কারণ এই চাপ

রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাকে ভেঙে ফেলে। সংগৃহীত রক্তকে নমুনা প্রেরণের টিউবে সরাসরি না ঢেলে টিউব এর প্রাচীর ঘেষে ঢালতে হবে। কখনই সুই এর ভিতরের সর্বশেষ রক্ত বিন্দুকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। যখন রক্ত জমাট দ্বানে বাধাদানকারী টিউব ব্যবহার করা হয় তখন না ঝাঁকিয়ে শুধুমাত্র কয়েকবার উপর নিচ করলেই হবে।

রক্তের নমুনা সংগ্রহে সাধারণত দুই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়ঃ

এন্টিকোয়াগুলেন্ট ব্যতীত: সাধারণত হোল ব্লাড থেকে সিরাম পৃথক করার জন্য কোনো এন্টিকোয়াগুলেন্ট ছাড়াই টেস্ট টিউবে রক্ত সংগ্রহ করতে হয়। রক্ত সংগ্রহ করার পরপরই টেস্ট টিউব সমান্তরাল জায়গায় হেলানো অবস্থায় রাখতে হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধার কয়েক ঘন্টা পর রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে। পরে প্রয়োজন হলে সেন্ট্রিফিউজ করে সিরাম সংগ্রহ করতে হয়। রেফ্রিজারেটরে এ সিরাম সংরক্ষণ করা যায় ৫-৬ দিন এবং ডীপ ফ্রিজে (-২০° সে) তা অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

এন্টিকোয়াগুলেন্ট সহযোগে: এর উদ্দেশ্য রক্ত জমাট বাঁধতে না দেয়া। প্রধানত হেমাটোলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য এন্টিকোয়াগুলেন্ট দিয়ে রক্ত সংগ্রহ করতে হয়।

রক্ত নমুনার বিশেষ কয়েকটি দিকঃ

- হোল ব্লাড বা সম্পূর্ণ ব্লাড নমুনা হিসেবে প্রেরণের অনপযুক্ত, কারণ রক্ত কণিকাসমূহ ভেঙে যায়। ফলে রক্তের বিভিন্ন মাত্রার পরিবর্তন হয়ে যায়। নমুনার ভিতরে রক্ত কণিকাকে শক্তি প্রদানের জন্য গ্লুকোজ ভেঙে যায় ফলে রক্তের মাত্রার পরিবর্তনে ফলাফলও বদলে যায়।
- রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন - থ্রম্বোসাইট, রক্তের গ্রুপ এবং পিসিআর পরীক্ষার জন্য EDTA Blood নমুনা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের আগে ফ্রিজিং করে প্রেরণ করতে হবে। তবে বেশিদিন ফ্রিজিং করলে রক্তের এম.সি.ভি (MCV) এবং হেমাটোক্রিটের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।
- রক্তের নমুনা যদি প্রেরণে (৪-৬) ঘন্টা দেরী হয়ে যায় তবে তা রক্তের বিভিন্ন মাত্রার উপর প্রভাব ফেলে দিতে পারে তাই অনেক সময় Blood Smear পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এজন্য শুষ্ক কাচের উপর ইডিটিএ সমৃদ্ধ রক্তের নমুনা প্রেরণ করা ভাল। এই পদ্ধতিতে রক্তে পরজীবি এবং ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ সহজ হয়ে থাকে।
- কোন কোন বিশেষ পরীক্ষার জন্য যেমনঃ- অ্যামোনিয়া, প্যারাথ হরমোন, সাইট্রিক প্লাজমা, ইনসুলিন, ইডিটিএ প্লাজমা, সেরাম প্লাজমা প্রভৃতি প্রেরণের জন্য ফ্রিজিং করে নমুনা প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

রক্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় সমূহঃ

হিমোলাইসিস: লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙ্গে গিয়ে ভেতরের পটাসিয়াম, লৌহ এবং হিমোগ্লোবিন বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাই হিমোলাইসিস। হিমোলাইসিসের কারণ হলো হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, নমুনা সংগ্রহে ভুল। যদি হিমোলাইসিস হয় তবে সতর্কতার সাথে ফলাফল নিতে হয়।

লাইপেমিয়া: রক্তের সেরাম বা প্লাজমার রং চর্বির কারণে সাদা হয়ে যাওয়াকে লাইপেমিয়া বলে। এর কারণ হলো খাদ্য গ্রহণ ও স্থুলতা।

কারণ	মাত্রা	ফলাফল
হিমোলাইসিসঃ	অ্যালবুমিন, আলফা অ্যামাইলেস, নেলেনিয়াম, লাইপেজ, ক্রিয়েটিনিন, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, ফসফেট	মাত্রা বাড়ে
	বিলিরুবিন, ফলিক এসিড, গ্লুকোজ, লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা	মাত্রা কমে
লাইপেমিয়াঃ	অ্যালকালাইন ফসফেট, বিলিরুবিন, ক্যালসিয়াম, ক্রিয়েটিনিন, হিমোগ্লোবিন	মাত্রা বাড়ে
	অ্যামাইলেজ, অ্যালবুমিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম	মাত্রা কমে

হিমোলাইসিস ও লাইপেমিয়া হরমোন ও সেরোলজিক্যাল বিভিন্ন পরীক্ষাতেও প্রভাব ফেলতে পারে। হিমোলাইসিস ও লাপেমিয়া প্রতিরোধে রক্ত সংগ্রহের ১২ ঘন্টা আগে প্রাণিকে অবশ্যই অভূক্ত রাখতে হবে।

প্লাজমা

রক্তের তরল অংশ হচ্ছে প্লাজমা যা রক্ত জমাট বাধা দানকারী Anticoagulant এর মিশ্রণে তৈরি করা হয়। সেরাম থেকে প্লাজমা তৈরি করা সহজতর এবং সেরাম এর নমুনা থেকে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এতে রক্ত কণিকা ভাঙার সম্ভাবনাও কম থাকে। তবে সংগ্রাহক টিউবে রক্তধারণ ক্ষমতার থেকে কম বা বেশি নেওয়া যাবে না। রক্ত নেয়ার পরপরই রক্ত সংগ্রাহক টিউবটি কয়েক বার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে Anticoagulant এর সাথে মিশাতে হবে এবং পরবর্তী ৫-১০ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ (৩৫০০ ঘূর্ণন/মিনিট) করতে হবে। সচরাচর Anticoagulant হল EDTA (ইথাইল ডাই অ্যামাইন টেট্রা এসিটেট), হেপারিন এবং সাইট্রেট। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে EDTA প্লাজমা রক্তের নিম্নলিখিত মাত্রাগুলো নির্ণয় করতে পারে না- পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ক্ষারীয় ফসফেট (Alkaline Phosphate), গ্লুকোজ এবং ল্যাকটেট।

সেরাম

সেরাম হচ্ছে রক্তের তরল অংশ যাতে ফাইব্রিন যুক্ত থাকে কিন্তু জমাটবাঁধা রক্ত কণিকা গুলো সরিয়ে ফেলা হয়। সেরাম সংগ্রহে প্লাজমা থেকে কম সময় লাগে। সেরাম সংগ্রহের জন্য রক্ত সংগ্রাহক নালীতে রক্ত তন্ত্রকে বাধাঁদান কারী (Anticoagulant) ব্যতীত রক্ত জমাট বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পরবর্তীতে সেরাম সংগ্রহ করতে হয়। উল্লেখ্য রক্ত জমাট বাধার সময় প্রজাতি, বয়স এবং প্রাণির স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। রক্ত জমাট বাধার পর ধারক টিউবকে সেন্ট্রিফিউজ করে (৩৫০০ ঘূর্ণন/মিনিট) সেরাম সংগ্রহ করা হয়।

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড

স্বাভাবিকভাবে সিএসএফ খুবই স্বচ্ছ। নমুনা সংগ্রহের সময় কোন প্রকার এন্টিকোয়াগুলেন্ট বা প্রিজারভেটিভ যোগ করতে হয় না। সিএসএফ এবং অন্যান্য যে কোন প্রকার তরল ভিন্ন একটি জীবাণুমুক্ত টিউবে সংগ্রহ করা হয় যদি ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কোন পরীক্ষা করতে হয় তবে অন্য আরেকটি সংগ্রাহক টিউবে নমুনা সংরক্ষণ করতে হয়।

মল পরীক্ষা

পরিপাকতন্ত্রের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য মল পরীক্ষা করা হয়। পশুর মলে কৃমি, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও বিষ নির্ণয় করা হয়।

* গবাদিপশুর মলদ্বার থেকে হাতের সাহায্যে নমুনা হিসেবে মল সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া সদ্য ত্যাগকৃত মলের ওপরের অংশ থেকে মল সংগ্রহ করা যেতে পারে।
* পোষা প্রাণীর (যেমন কুকুর বিড়াল) ক্ষেত্রে থার্মোমিটার, গ্লাস রড বা ওভাটেক প্ল্যাসের সাহায্যে মল সংগ্রহ করা যায়।
* সাধারণত প্রতিটি পশু থেকে ৫ গ্রাম করে মল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মল সংগ্রহের দিন মল পরীক্ষা না করতে পারলে মলকে রেফ্রিজারেটর (৪°-৮° সে) সংরক্ষণ করতে হয় যাতে কৃমির ডিমের মধ্যে লার্ভা সৃষ্টি না হতে পারে।
* মলের কৃমি পরীক্ষার জন্য তা গবেষণাগারে পাঠাতে হলে সমপরিমাণ ১০% ফরমালিন সহযোগে প্লাসটিকের পাত্রে পাঠাতে হয়।

মূত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সাধারণত বকন বা গাভী দাঁড়ানো অবস্থায় পা ছড়িয়ে বা ফাঁক করে লেজ উঁচু করে মূত্র ত্যাগ করে। মূত্র ত্যাগকালে এদের মূত্র সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া স্ত্রী পশুর যোনিমুখ ও পেরিটোনিয়াম অথবা মলাশয়ের ভিতর হাত প্রবেশ করিয়ে মূত্রাশয় মর্দন বা ম্যাসেস করে প্রস্রাব করানো যায়। তবে এসব পদ্ধতিতে মূত্র সংগ্রহকালে তা জীবাণু কর্তৃক দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্ত্রী পশুর ক্ষেত্রে সরাসরি মূত্রাশয়ে ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে মূত্র সংগ্রহ করা উত্তম। ষাঁড় বা বলদের ক্ষেত্রে মূত্রাশয় মর্দন করে মূত্র ত্যাগ করানো যায়। পরীক্ষার জন্য ১২০ মিলি মূত্রের প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষার জন্য মূত্র রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া ১ ফোঁটা টলুইন (toluene) অথবা থাইমোলের একটি ক্রিস্টাল মূত্রে যোগ করা যেতে পারে। মূত্রে সেডিমেন্টের কোষ ও কাস্টের গঠন সঠিক রাখার জন্য প্রতি ৩০ মিলি মূত্রে ১ ফোঁটা ফরমালিন (৩৭%) যোগ করতে হয়।

Biopsies organ part, aborted materials

পদ্ধতি নিম্নরূপ-

- দূষণমুক্ত টিউবে নমুনাটি সংগ্রহ করতে হবে এবং নমুনাটি সেলাইন দ্বারা ঢেকে দিতে হবে
- যদি নমুনাটি পরবর্তী দিনে পাঠানো হয় তবে নমুনাটি ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে
- কোন স্যালাইন ব্যবহার করা যাবে না এবং নমুনার গায়ে লিখে দিতে হবে যে নমুনাটি ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়েছে কোন ধরনের থয়িং বা ফ্রিজিং করা যাবে না

নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ

১) **ফোঁড়া (abscess):** ফোঁড়া ছিদ্র করে জীবাণুমুক্ত সোয়াব বা পাত্রে নির্গলিত রস সংগ্রহ করতে হবে। কয়েকটি স্লাইডে স্মিয়ার তৈরি করা যায়।

২) **এক্টিনোব্যাসিলোসিস:** ক্ষতস্থান ছিদ্র করে নির্গলিত পুঁজ জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নির্গলিত রস দিয়ে কয়েকটি স্লাইডে স্মিয়ার তৈরি করা যায়। কিছু আক্রান্ত টিস্যু ১০% ফরমালিনে সংগ্রহ করা যায়।

৩) **এক্টিনোমাইকোসিস রোগ:** ক্ষতস্থান ছিদ্র করে নির্গলিত পুঁজ জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নির্গলিত রস দিয়ে স্লাইডে স্মিয়ার তৈরি করা যায়। আক্রান্ত টিস্যু ১০% ফরমালিনে সংগ্রহ করা যায়।

৪) **তড়কা রোগ:** জীবাণু চাষের জন্য রক্তের সোয়াব প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। কান বা লেজের অগ্রভাগ থেকে রক্ত বের করে স্লাইডে কয়েকটি স্মিয়ার তৈরি করে তাপে শুকিয়ে নিতে হয়। র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্টের জন্য সিরিঞ্জের সাহায্যে হোল ব্লাড (এন্টিকোয়াগুলেন্টসহ), সিরাম বা প্লাজমা (এন্টিকোয়াগুলেন্ট ব্যতীত) সংগ্রহ করে পাঠাতে হবে।

৫) **বাদলা রোগ:** আক্রান্ত মাংসপেশী ছিদ্র করে নির্গলিত রস দ্বারা কয়েকটি স্মিয়ার ও সোয়াব প্রস্তুত করতে হয়। মৃত পশুর মাংসপেশীর টুকরা (২ ইঞ্চি পরিমাণ) জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংগ্রহ করতে হয়।

৬) **ব্রুসেলোসিস রোগ:** জীবাণুমুক্ত পাত্রে দুধ সংগ্রহ করতে হয়। র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্টের জন্য সিরিঞ্জের সাহায্যে সিরাম বা প্লাজমা সংগ্রহ করতে হয়। স্টেইন ও কালচারের জন্য জরায়ুর স্রাবের স্মিয়ার ও সোয়াবের প্রয়োজন হয়।

৭) **গলাফোলা রোগ:** রক্ত ও ফোলা স্থানের রস দ্বারা স্মিয়ার প্রস্তুত করতে হবে। মৃত পশুর প্লীহা, যকৃত ও হৃৎপিন্ডের নমুনা নিতে হয়।

৮) **ম্যাসটাইটিস (ওলান ফোলা রোগ):** জীবাণুমুক্ত পরিবেশে দুধ সংগ্রহ করে রেফ্রিজারেটরে (৪-৮° সেন্টিগ্রেডে) সংরক্ষণ করতে হয়।

৯) **জোনস্ ডিজিজ (Johne's disease):** রেক্টাল স্ক্যাপিং স্মিয়ার তৈরি করে উত্তাপে ফিক্সড করে পাঠাতে হয়। আক্রান্ত অন্ত্রের অংশ ১০% ফরমালিনে সংরক্ষণ করতে হয়।

১০) **ধনুস্টংকার:** জীবাণু স্বতন্ত্রীকরণের জন্য ক্ষতের সোয়াব ড্রাই আইসে নিতে হয়। টক্সিন নির্ণয়ের জন্য রক্ত বা সিরাম নিতে হয়।

১১) **যক্ষ্মারোগ:** র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্টের জন্য সিরিঞ্জের সাহায্যে সিরাম বা প্লাজমা সংগ্রহ করতে হয়। জীবাণুমুক্ত পাত্রে দুধ সংগ্রহ করতে হয়। এসিড ফাস্ট স্টেইনের জন্য আক্রান্ত স্থান থেকে স্মিয়ার নিতে হয়।

১২) **সালমোনেলোসিস:** মল ও মৃত পশুর যকৃত, প্লীহা ও অন্ত্রের অংশ নিতে হয়। সিরোলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য রক্ত নিতে হয়।

১৩) **ক্ষুরারোগ:** আক্রান্ত পশুর রসসহ ফোস্কা ফসফেট বাফার স্যালাইনে সংগ্রহ করতে হবে। সিরোলজিক্যাল পরীক্ষা জন্য রক্ত নিতে হবে।

১৪) **জলাতঙ্ক (Rabies):** আক্রান্ত প্রাণীর লালা র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্টের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। ইলাইজা টেস্টের জন্য আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত নিতে হবে। র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট ও হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য মস্তিস্ক ৫০% গ্লিসারিনে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫) **বসন্ত রোগ:** ঠান্ডা অবস্থায় (বরফ সহযোগে) ফোস্কার রস ও মামড়ি সংগ্রহ করতে হবে।

১৬) **রিন্ডারপেস্ট:** মুখ গহ্বরের মিউকোসার ক্ষতের ইমপ্রেশন স্মিয়ার নিতে হয়। নিউট্রালাইজেশন টেস্টের জন্য সিরাম/রক্ত সংগ্রহ করতে হয়। হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য ইলি-ও-সিক্যাল ও সিকো কলিক সংযোগস্থল ১০% ফরমাল-স্যালাইনে সংগ্রহ করতে হয়।

১৭) **ককসিডিয়া:** মল সংগ্রহ করতে হবে। আন্ত্রিক স্ক্র্যাপিং ১০% ফরমাল স্যালাইনে সংগ্রহ করতে হবে।

১৮) **বিষক্রিয়া:** ১০০ গ্রাম খাদ্য বস্তু ও ৫০ গ্রাম পাকস্থলীর বস্তু সংগ্রহ করতে হবে।

১৯) **দুগ্ধবতী গাভীতে পূর্বাহ্নে গর্ভধারণ নিরীক্ষণ:** কৃত্রিম প্রজনন করানোর ২১ দিন পর দুধ সংগ্রহ করে বরফ সহযোগে পাঠাতে হবে।

ঔষধের ক্ষেত্রে নমুনা

Sample type	Samples	Instrument & appliences	Collection process	Purpose of analysis
Solid	Tablet, capsule,granules etc	Forceps, container	Randomly select some from a batch of drug	Hardness, Size, shape, friability, uniformity of drug, disintegration test, dissolution test etc
Semi solid	Cream, ointment, lotion, paste etc	Container or aluminium foil paper	Collecting sample before discard initial some	Uniformity of medicament, moisture content, solvent quqlity etc
Liquid	Syrup, emulsion, hustus etc	Screw capped container	Before collecting make a homogenous mixture	Taste , color, odour, uniformity of medicament, moisture content, solvent quqlity etc
Powder	powder	Spatula, container	Before collecting make a homogenous mixture	Particle size, quality etc
Plant	Root, bark, leaf etc	Knife, scissiors, container or bag	Sample must be cleaned by water after initial collection	Active ingredient quality analysis

General advice on Molecular biology test, EDTA Blood, Citrate Blood

- নমুনার পরিমাণ পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। তবে কখনই জমাট বাধানো ইডিটিএ বা সাইট্রেট যুক্ত রক্ত পাঠানো যাবে না।
- পরিপাকতন্ত্রের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য মল পরীক্ষা করা হয়। পশুর মলে কৃমি, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও বিষ নির্ণয় করা হয়। কোট বিহীন দূষন মুক্ত টিউবে পাঠাতে হবে।
- আদর্শ নমুনার পরিমাণ ০.৫-২ মিলি ইডিটিয়ে সমৃদ্ধ রক্ত। সবরাহের জন্য সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়। বংশগতি নির্ণয়ের জন্য সাধারণত ০.৫ মিলি রক্ত বা মুখবিবরের ত্বকের উপরের অংশ (buccal mucosal membrane) নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Buccal Mucosal Membrane থেকে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি

১. নমুনা সংগ্রহের পূর্বে প্রাণীকে কোন প্রকার খাবার বা তরল (পানি ব্যতীত) কোন কিছু গ্রহন করা হতে বিরত রাখতে হবে।
২. জীবাণু মুক্ত কটন দ্বারা অন্তত ১০ বার মুখবিবরকে ঘর্ষণ করতে হবে
৩. পরিবাহক কন্টিনারকে সঠিক ল্যাবেলিং করতে হবে
৪. ঘরের তাপমাত্রায় নমুনাটিকে এক দুই ঘন্টা শুকিয়ে নিতে হবে এবং
৫. বায়ুরোধী টিউবের সাহায্যে দ্রুত গবেষণাগারে প্রেরণ করতে হবে।

জীবাণুর মলিকুলার পরীক্ষার নমুনা

নিম্নলিখিত নমুনা গুলো পিসিআর পরীক্ষার দ্বারা সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে নমুনা সংগ্রহের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো বিবেচনা করতে হবে।

১. প্রাণীতে বর্তমানে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আছে কি না?
২. জীবানুটি তার কাংক্ষিত অঙ্গে (টার্গেট অর্গান) আছে কি না?
৩. রোগের জীবাণু কোন বিশেষ অঙ্গে বা তন্ত্রের প্রতি যোগ আছে কি না?

পিসিআর (PCR)

পিসিআর হলো মেডিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পিসিআর -এর মাধ্যমে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর জীন নির্ণয় করে জীবাণুর প্রকার ও ধরন নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমায় সন্তানের পিতা-মাতা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পিসিআর ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও সন্দেহাতীতভাবে ক্রিমিনাল বা আসামি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পিসিআর অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র: পিসিআর মেশিন বা থারমাল সাইক্লার (PCR Machine or Thermal Cycler)।

পিসিআর বলতে আমরা কি বুঝি?

পিসিআর অর্থ হলো (Polymerase chain reaction)। তার মানে হলো সামান্য সংখ্যক ডিএনএ অথবা জীন হতে পিসিআর -এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি সংখ্যক ডিএনএ বা জীন তৈরি করা। সামান্য সংখ্যক ডিএনএ বা জীন হতে জীবাণু নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় বিধায় তাদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিটি আবিস্কার করেন কেরি মুলিস (Kary Mullis) নামক একজন আমেরিকান বায়োকেমিষ্ট। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিস্কারের জন্য ১৯৯৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

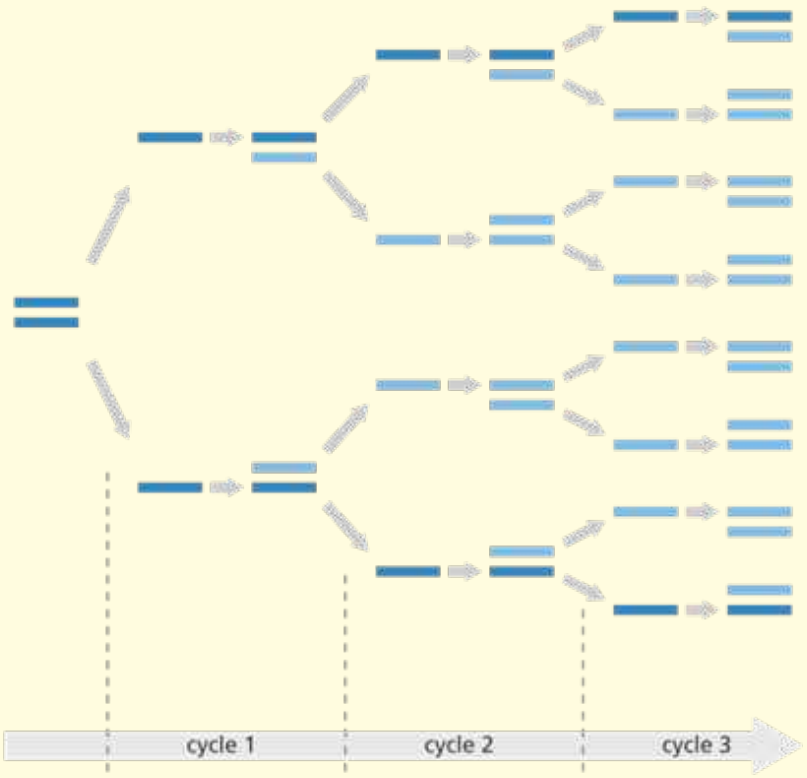

চিত্রঃ পিসিআর বিক্রিয়ার একেক ধাপে উৎপন্ন ডিএনএ এর সংখ্যা।

পিসিআর কিভাবে কাজ করে?

প্রধানত ৫টি উপাদানের সমন্বয়ে পিসিআর কাজ করে থাকে। উপাদান গুলো হলো-

১। যে ডিএনএ বা জীনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে তার টেমপ্লেট (Template) বা ছাঁচ।

২। প্রাইমার বা ছোট চেইন ডিএনএ। প্রাইমার ডিএনএ -এর উভয় পার্শ্বে বন্ধন তৈরি করে পিসিআর বিক্রিয়া শুরু করে থাকে।

৩। ডিএনটিপিস্ (dNTPs)। এগুলো ডিএনএ নিউক্লিওটাইটড বেসেস্ (DNA nucleotide bases) -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ডিএনএ বেস গুলো হলো এ সি জি এবং টি (A, C, G, and T)। উদাহরণস্বরূপ এই বেস গুলোকে ভবন তৈরিতে ব্যবহৃত ইটের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।

৪। টেক পলিমারেজ এনজাইম (Taq polymerase enzyme)। এই এনজাইম ডিএনএ বেস গুলোকে একটির সাথে অন্যটি জোড়া লাগায়। উদাহরণস্বরূপ এটিকে ইট জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত সিমেন্টের সাথে তুলনা করা যায়।

৫। বাফার (Buffer)। এটি পিসিআর বিক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখে।

পিসিআর -এর ধাপসমূহ

পিসিআর নিম্নলিখিত প্রধান ৩টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১। **ডিনেচারিং:** এই ধাপে ৯৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ডাবল-স্ট্রানডেড ডিএনএ আলাদা হয়ে সিঙ্গেল-স্ট্রানডেড ডিএনএ তে পরিণত হয়।

২। **এনিলিং:** এই ধাপে সাধারণত ৫০-৫৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় প্রাইমার সিঙ্গেল-স্ট্রানডেড ডিএনএ -এর প্রান্তে সংযোগ ঘটে।

৩। **এক্সটেন্ডিং/ইলংগেশন:** এই ধাপে টেক পলিমারেজ এনজাইম (Taq polymerase enzyme) সংযোগকৃত প্রাইমারের সাথে একের পর এক ডিএনএ বেস যোগ করে টেমপ্লেট ডিএনএ -এর অনুরূপ ডিএনএ তৈরি করে। এভাবে নতুন তৈরিকৃত ডিএনএ-কে সিডিএনএ (cDNA) বলে।

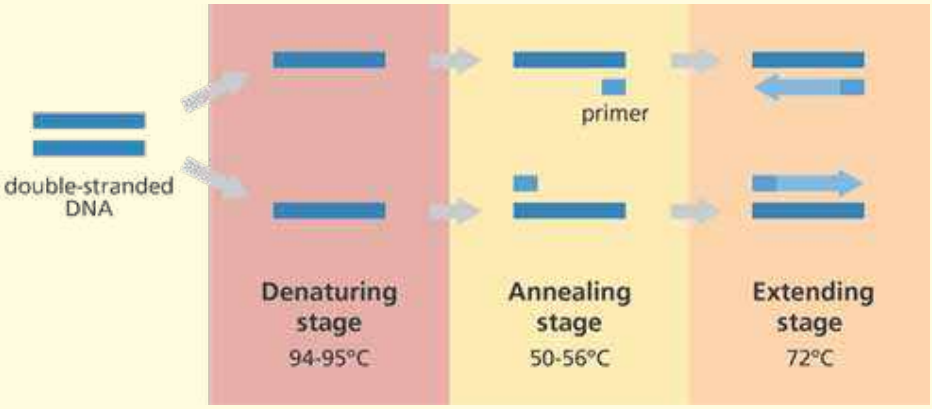

চিত্রঃ পিসিআর বিক্রিয়ার ধাপসমূহ।

পিসিআর বিক্রিয়ায় বৃদ্ধিকৃত ডিএনএ বা জীন কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

পিসিআর বিক্রিয়ায় বহুগুণে বৃদ্ধিকৃত ডিএনএ বা জীন আগার জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করে নির্ণয় করা হয়। আগার জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলে যদি নমুনায় নির্ধারিত রোগ জীবাণুর ডিএনএ বা জীন উপস্থিত থাকে, তাহলে আগার জেলের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি দাগ (Band) দেখা যাবে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত ১ - ১২ টি নমুনার মধ্যে ৮ টি নমুনায় নিশ্চিতভাবে সালমোনেলার জীবাণু রয়েছে। ১৩ নং নমুনায় শুধুমাত্র পানি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নেগেটিভ কন্ট্রোল নামে পরিচিত।

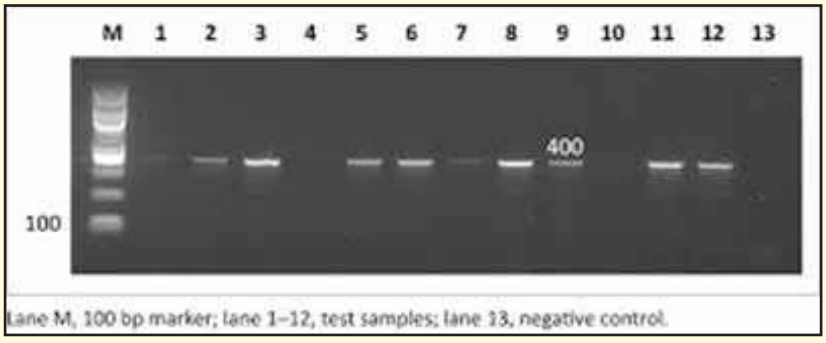

চিত্র: আগার জেল ইলেকট্রোফোরেসিস -এর মাধ্যমে সালমোনেলা জীবাণুর ডিএনএ বা জীন এর নিশ্চিত উপস্থিতি।

পাঠ - ৯
খাদ্য সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহ

সংক্রমিত অথবা বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক খাদ্য-বাহিত রোগে ভোগেন- যা সাধারণত কঠিন উদরাময়, বমি এবং পেটে খিল ধরা হিসেবে দেখা দেয়। অনেক ঘটনারই খোঁজ পাওয়া যায়না। আক্রান্তদের মধ্যে বিশেষ করে খুবই অল্পবয়স্ক, বয়োবৃদ্ধ এবং দুর্বল লোকেরা মারা যায়। খাদ্যবস্তু সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যাপারে যে সমস্ত আইন বর্তমানে রয়েছে তা কঠিনভাবে প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য শুধু এটাই যথেষ্ট নয়। অসাবধানতা এবং অজ্ঞতাই সাধারণত খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টির কারণ। এজন্য খাদ্যবস্তু সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বর্তমানের দু:খজনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে খাদ্যবস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদান করা। একটি আধুনিক খাদ্যবস্তু তৈরির জায়গায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন একজন কর্মীর একটি ভুলের জন্য খাদ্যবস্তুতে বিষক্রিয়া গুরুতরভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। খাদ্যবস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে পেশায় যোগ দেয়ার শুরু থেকেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনের একটি ধারা হিসেবে নিতে হবে; কেননা খারাপ অভ্যাস একবার স্বভাবগ্রস্থ হয়ে গেলে তা বদলানো খুবই কঠিন।

খাদ্য সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংগা

খাদ্য সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শুধুমাত্র পরিষ্কার-পরিছন্নতাকেই বোঝায় না; এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজ, যেমন:-

- ক্ষতিকর জীবাণু, বিষ (টক্সিন) এবং অজানা ক্ষতিকর জিনিস থেকে খাদ্যবস্তুতে সংক্রমণ রোধ করা,
- খাদ্যে উপস্থিত জীবাণুকে সেই পরিমাণে বাড়তে না দেয়া যাতে আহারকারী রোগাক্রান্ত হতে পারে অথবা খাদ্যবস্তুকে নষ্ট করতে পারে,
- পুরোপুরি কুক (রান্না) করা বা অন্য উপায়ে খাদ্যে ক্ষতিকর জীবাণু বিনাশ করা।

নিম্নমানের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কুফল

- খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে এবং মানুষের মৃত্যুও হতে পারে,
- খাদ্যে জীবাণু সংক্রমণের কারণে ক্রেতারা অভিযোগ করতে পারে,
- নষ্ট হয়ে যাওয়ায় খাদ্যের অপচয় হতে পারে,
- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আইন-কানুন ভঙ্গ করার ফলে জরিমানা এবং মামলার ঝামেলায় পড়তে হতে পারে,
- খাদ্য প্রস্তুতের জায়গাকে সংক্রমণমুক্ত করার জন্য বাড়তি সময় এবং অর্থের অপচয় হয়।

ভাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মেনে চলার সুফল

- ক্রেতা সন্তুষ্ট থাকে, সুনাম এবং বাড়তি ব্যবসা হয়,
- আইন মেনে চলায় আত্মবিশ্বাস বাড়ে,
- কাজ করার ভাল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, কর্মীরা সন্তুষ্টচিত্তে আগ্রহের সাথে কাজ করে, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

জীবাণু

জীবাণু হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র জীব, যা সর্বত্রই থাকে; যেমন মানুষের গায়ে বা ভিতরে, খাবারে, পানিতে, মাটিতে এবং বাতাসে। অধিকাংশ জীবাণুই ক্ষতিকর নয়। কিছুসংখ্যক অতি প্রয়োজনীয়, যেমন- যেমন হজমের সময় খাদ্যবস্তুকে খুবই ছোট ছোট অংশে ভেংগে ফেলা, অথবা পনির এবং দই তৈরিতে তাদের উপকারী ব্যবহার। যা হোক, অল্পসংখ্যক জীবাণু খাদ্য নষ্ট করে এবং কিছু জীবাণু আছে যাদেরকে 'প্যাথোজেনস' বলা হয়, সেগুলির কারণে অসুখ হয়। এছাড়া কিছু জীবাণু আবার খাদ্যে বিষ (টক্সিন) সংক্রমণ করে; এরা খাবারে অথবা শরীরের ভিতরে বিষ (টক্সিন) সৃষ্টি করে।

জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা

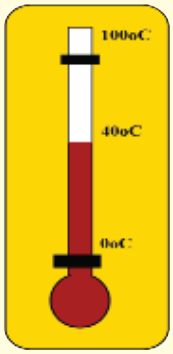

যেসব জীবাণু খাদ্যে বিষ (টক্সিন) সংক্রমণ করে সেগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিষ (টক্সিন) সৃষ্টি করার জন্য নিম্নোক্ত অবস্থার প্রয়োজন হয়:

উত্তাপ বা তাপমাত্রা- অধিকাংশ জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সব থেকে ভাল তাপমাত্রা হচ্ছে ৩৭ ডিঃ সেঃ (আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা), যদিও সেগুলি ২০ ডিঃ সেঃ থেকে ৫০ ডিঃ সেঃ এর মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে। এ গুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্য বস্তুকে সবসময় ৫ ডিঃ সেঃ এর নিচে রাখতে হবে। খাবার তৈরির গরম ঘরে বিষ সৃষ্টিকারী জীবাণু তাড়াতাড়ি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় (১ থেকে ৪ ডিঃ সেঃ) সংরক্ষণ করা হলে (রেফ্রিজারেটরে, চিলরুম বা শৈত্য কক্ষে, বরফ সহযোগে) জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সাধারণত স্থবির হয়ে যায়।

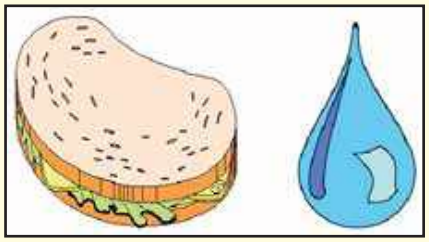

খাদ্য এবং আর্দ্রতা- অধিক প্রোটিনযুক্ত আর্দ্র খাবারে জীবাণু বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা থাকে, যেমন মাছ, মাংস, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে প্রোটিনযুক্ত শুষ্ক খাবারে জীবাণু বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা থাকেনা, যেমন-গুড়ো দুধ, শুটকী মাছ, ইত্যাদ। অন্যান্য খাবার যেগুলো জীবাণু বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনা সেগুলো হচ্ছে, যাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় লবন, চিনি, অ্যাসিড অথবা অন্যান্য সংরক্ষণকারী বস্তু থাকে।

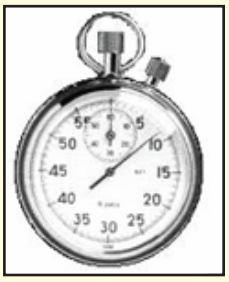

সময়- জীবাণু বিভিন্ন ভাবে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। খাদ্য, আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা, এগুলোর সঠিক সমন্বয়ের অবস্থায় একটি জীবাণু পূর্নাঙ্গ আকারের বৃদ্ধি পায় অত:পর বিভক্ত হয়ে দুটি হয়; এই প্রক্রিয়াকে বাইনারী ফিসন' বলা হয়। এইভাবে একটি অণুজীব বিভক্ত হয়ে দু'টি হয়, দু'টি চারটিতে, চারটি আটটিতে, আটটি ষোলটিতে, এভাবে চলতে থাকে। প্রতিবার দ্বিগুণ হওয়ার মাধ্যমে জীবাণুগুলো অত্যন্ত দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। অনুকূল অবস্থায় কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রতি ১০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়। একটি জীবাণু এভাবে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে ৩ ঘন্টা ২০ মিনিটে ১০,০০০০০-এ বৃদ্ধি পেতে পারে। জীবাণু যদি যথেষ্ট সময় পায় তাহলে তারা এমনভাবে বাড়তে থাকে যে খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করার মত সংখ্যায় পৌছায়। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যেসব খাদ্য ক্ষতিকর জীবাণু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সেগুলিকে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বিপদজনক এলাকায় ফেলে রাখা না হয়। সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ অণুজীবের দৈহিক ও বংশ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য উপাদানসমূহ অর্থাৎ খাদ্য, পানি এবং তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা তাদের বংশ বৃদ্ধির গতিকে আরো মন্থর করতে পারি।

ব্যাকটেরিয়া যেভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে

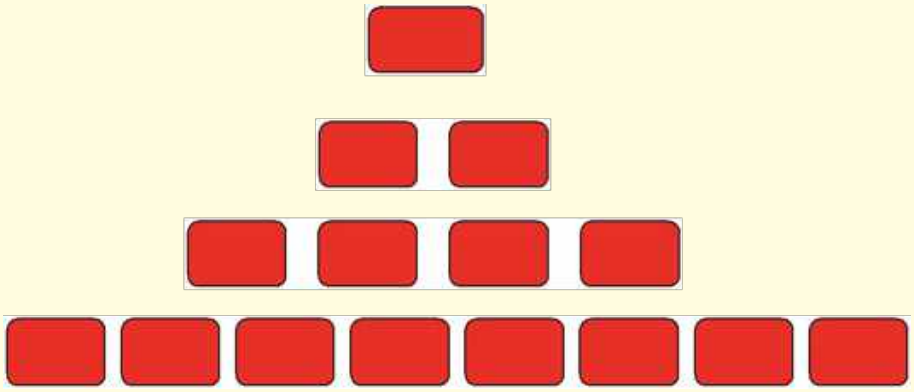

ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সংখ্যা তাত্ত্বিক হিসাব

ঘন্টা	মিনিট	ব্যাকটেরিয়া	ঘন্টা	মিনিট	ব্যাকটেরিয়া
0	0	1	2	120	4,096
	10	2		130	8,192
	20	4		140	16,384
	30	8		150	32,768
	40	16		160	65,536
	50	32		170	1,31,072
1	60	64	3	180	2,62,144
	70	128		190	5,24,288
	80	256		200	10,48,576
	90	512			
	100	1,024			
	110	2,048			
মোট =			৩ ঘন্টা ২০ মিনিট		১০,৪৮,৫৭৬

খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং খাদ্য-বাহিত রোগসমূহ

খাদ্যে বিষক্রিয়া একটি অস্বস্তিকর অসুস্থতা যা সাধারণত সংক্রমিত অথবা বিষাক্ত খাদ্য খাওয়ার ১ থেকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ঘটে। রোগের লক্ষণগুলো- পেটের ব্যাথা, দাস্ত, বমি করা বা বমি বমি ভাব। এই অবস্থা সাধারণত ১ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত থাকে এবং এর মধ্যে একটি বা তার অধিক লক্ষণ থাকতে পারে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রধান কারণসমূহ-

- জীবাণু অথবা তাদের বিষাক্ত পদার্থ,
- সংক্রামক রোগের জীবাণু,
- ভাইরাসসমূহ,
- রাসায়নিক পদার্থসমূহ, যেমন- কীট-পতঙ্গ নাশক, আগাছা নাশক, ইত্যাদি,
- ধাতব পদার্থসমূহ, যেমন- সীসা, তামা এবং পারদ,
- বিষাক্ত উদ্ভিদসমূহ, যেমন- মারাত্মক রকম বিষাক্ত এক ধরনের লতা এবং ব্যাঙের ছাতা।

বি:দ্রঃ খাদ্যে বিষক্রিয়া সবচেয়ে বেশী ঘটে জীবাণু থেকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা থেকে মৃত্যু হতে পারে; এর জন্য বহু সংখ্যক জীবাণুর প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে তাদেরকে খাদ্যের মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার সাধারণ জীবাণুসমূহ

০১। স্যালমোনেলা

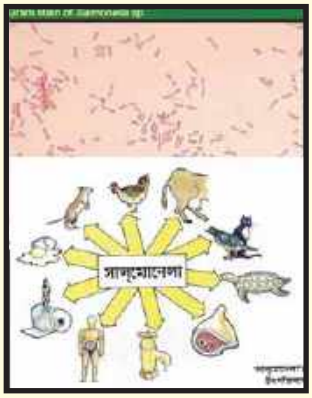

উৎপত্তিস্থল- কাঁচা খাবার, বিশেষত মাংস, দুধ, ডিম, বিভিন্ন ধরনের বাহন, জীবজন্তু, ইঁদুর, পাখি, মাছি, নদীচর কচ্ছপ, ইত্যাদি।
আক্রমণের কাল- ৬ থেকে ৭২ ঘন্টা (সাধারণত ১২ থেকে ৩৬ ঘন্টা)।
লক্ষণসমূহ- পেটের ব্যাথা, দাস্ত, বমি করা এবং জ্বর, যা ১ থেকে ৭ দিন থাকে।
খাদ্যে কিভাবে বিস্তার লাভ করে- জীবজন্তু ও মানুষের মল-মূত্র থেকে, জীবজন্তু ও মানুষের মল-মূত্র সংক্রমিত পানি থেকে, সংক্রমিত কাঁচা খাদ্যের সংগে প্রত্যক্ষ স্পর্শ অথবা পরোক্ষভাবে খাদ্য তৈরি করার টেবিল, সরঞ্জাম এবং হাতের মাধ্যমে। কীট-পতঙ্গের মল-মূত্র থেকেও স্যালমোনেলা খাদ্যে সংক্রমিত হতে পারে।
নিয়ন্ত্রণ- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা, খাদ্য তৈরির সকল স্তরে

নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা, খাদ্যসামগ্রীর জায়গায় কীট-পতঙ্গ এবং পশুপাখি না থাকা, খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাপমাত্রার কঠোর নিয়ন্ত্রণ।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট- কিছু ধরনের স্যালমোনেলা খুব কম সংখ্যা দিয়েই খাদ্য সামগ্রীতে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রকাশিত ঘটনাবলীর ৮০% থেকে ৯০% এর জন্য এগুলিই দায়ী।

০২। ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স্

'ক্লস্ট্রিডিয়াম্ পারফ্রিঞ্জেন্স্'-এর উৎপত্তিস্থল

উৎপত্তিস্থল- জীবজন্ত এবং মানুষের মল, মাটি (সবজির গায়ে), ধুলা, কাঁচা মাংস, মাছি, আরসোলা এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গ।

আক্রমণের কাল- ৮ থেকে ২২ ঘন্টা (সাধারণত ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা)।

লক্ষণসমূহ- পেটের ব্যাথা, দাস্ত, বমি কদাচিৎ হয়। অসুস্থতা সাধারণত ১২ থেকে ৪৮ ঘন্টা থাকে।

খাদ্যে কিভাবে বিস্তারলাভ করে- কাঁচা মাংস অথবা সব্জিতে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ লাগায় অথবা পরোক্ষভাবে খাদ্য তৈরি করার টেবিল, সরঞ্জাম এবং হাতের মাধ্যমে।

নিয়ন্ত্রণ- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভাল ব্যবহারবিধি অনুসরণ করা। তাপমাত্রার কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ বেশিষ্ট্য- এই ব্যক্টেরিয়া এক প্রকার গুটি (স্পোর) তৈরি করে প্রতিকূল তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। এরা অক্সিজেন পছন্দ করে না। খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রকাশিত ঘটনাবলির ৫% থেকে ১৫% এর জন্য এগুলোই দায়ী।

০৩। স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস

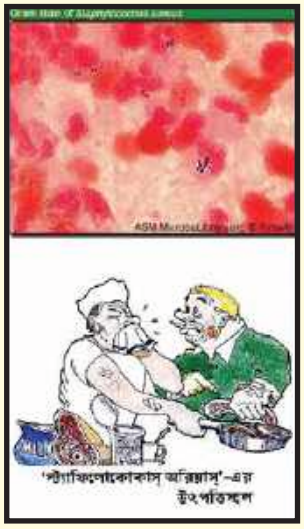
'স্টাফিলোকোকাস্ অরিয়াস'-এর উৎপত্তিস্থল

উৎপত্তিস্থল- মানুষের নাক, মুখ, চামড়া, ফোড়া, এবং কাটা ঘা, গরু অথবা ছাগলের কাঁচা দুধ।

আক্রমণের কাল- ১ থেকে ৬ ঘন্টা।

লক্ষণসমূহ- পেটের ব্যাথা, বমি, অসহায় অবস্থায় শুয়ে পড়া এবং স্বাভাবিকের নিচে তাপমাত্রা। খাদ্যে কিভাবে বিস্তারলাভ করে- সাধারণত নাক, মুখ, চুল, দূষিত কাটা ঘা অথবা ব্রণ ছোঁয়ার পর হাতের মাধ্যমে।

নিয়ন্ত্রণ- প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যসামগ্রী না ধরা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মেনে চলা, বিশেষত হাত ধোয়ার নিয়ম সঠিকভাবে অনুসরণ করা। কাটা ফোড়ায় পানি-নিরোধক পট্টি ব্যবহার করা। যেসব কর্মচারীর ফোঁড়া এবং বিষাক্ত কাটা ঘা আছে অথবা যারা হাঁচি-কাসিতে ভুগছেন তাদেরকে কাজ থেকে বাদ দিতে হবে। খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- খাদ্য সামগ্রীতে এক প্রকারের বিষ (টক্সিন) সৃষ্টি করে যা রান্নার সাধারণ তাপমাত্রায় বিনাশ করা যায়না। খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রকাশিত ঘটনাবলীর ১% থেকে ৪% এর জন্য এগুলো দায়ী।

খাদ্যবাহিত রোগসমূহ- অন্যান্য জীবাণুজনিত অসুস্থতা যেগুলি খাদ্যের মাধ্যমে ঘটতে পারে এর মধ্যে রয়েছে টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, টিউবারকিউলিসিস্, ডিসেন্ট্রি এবং ব্রুসেলোসিস্। যাহোক, শুধু অল্প সংখ্যক জীবাণু দ্বারাই অসুস্থতা সৃষ্টি হতে পারে এবং এক্ষেত্রে খাদ্যে জীবাণুজনিত বিষক্রিয়ার জন্য খাদ্যের ভিতরে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। যেসমস্ত জীবাণু এর জন্য দায়ী সেগুলো অন্যান্য জায়গা ছাড়াও মানুষের অন্ত্রে পাওয়া যায় এবং সংক্রমণের ধরন খাদ্যে বিষক্রিয়ার সংক্রমণের মতই, যেমন: খাদ্যবাহিত রোগের জন্য দায়ী আরো ২টি জীবাণু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ক্যাম্পিলোব্যাক্টার'; যা 'স্যাল্মোনেলার' থেকেও মারাত্মক এবং 'লিস্টেরিয়া'; যা ৩ ডিঃ সেঃ এর নীচের তাপমাত্রাতেও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।

পাঠ - ১০
খাদ্যকর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি

যে সমস্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণ কাজে নিয়োজিত বা পরোক্ষভাবে খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসে (অর্থাৎ আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি বা অন্য খাদ্যস্পর্শী বস্তুর পরিচালন বা ধোয়ামোছার কাজে নিয়োজিত) তাদের দ্বারা খাদ্যের দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যক্তির নিজস্ব শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। খাদ্যকর্মীর (food handler) হাত, ঘাম, চুল, নিশ্বাস ইত্যাদির দ্বারা জীবাণু খাদ্যে সংক্রামিত হয়। এই খাদ্যকর্মীদের সঠিকভাবে কাজ করার জ্ঞানের অভাব, অলসতা, বিমুখতা এবং দৈনন্দিন বদ অভ্যাসের কারণে শত শত ভোক্তা রোগাক্রান্ত বা জীবনহানীর সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিগত পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রতিটি খাদ্যকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব এবং এর প্রতি তাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মৎস্য খামার, ডিপো, অবতারণ কেন্দ্র এবং কারখানা পর্যায়ের প্রতিটি খাদ্যকর্মীকে অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে, কখন ও কোথায় খাদ্যে দূষণ ঘটে এবং তা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

খাদ্যকর্মী কিভাবে খাদ্য দূষণ ঘটায়?

- খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে
- পেট অসুখে (ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়) আক্রান্ত হলে
- কাটা ঘা, ক্ষত ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হলে
- কোন খাদ্যবাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বসবাস বা সংস্পর্শে আসলে
- কোন দূষিত পদার্থ স্পর্শ করে থাকলে

খাদ্যবাহিত রোগজীবাণু ও রোগ

পেটের বা অন্ত্রের অসুখ, যেমন আমাশয়, ডায়রিয়া (দাস্ত, বমি) টাইফয়েড জ্বর, জন্ডিস এবং শ্বাসনালীর অসুখ, যেমন - জ্বরসহ গলাব্যাথা, নিউমোনিয়া, যক্ষা, সর্দি ইত্যাদি রোগ জীবাণু খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। খাদ্যে প্রায় ৪০ প্রকারের অধিক ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবি এবং ছত্রাকের উপস্থিতি খাদ্যবাহিত রোগ সৃষ্টির উৎস্য। এর মধ্যে Big-5 নামে পরিচিত নরোভাইরাস (Norovirus), স্যালমোনেলা টাইফি (Salmonella typhi), সিগেলা (Shigella spp), এবং ইশ্চারিশিয়া কোলি (Escherichia coli) সংক্ষেপে E. coli দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী খাদ্য দূষণ ঘটে। এছাড়াও কম ক্ষতিকর জীবাণু Staphylococcus aureus, Salmonella spp এবং Streptococcus pyogenes খাদ্যকর্মীর মাধ্যমে খাদ্যে দূষণ ঘটায়। এক কন্টেইনার চিংড়ি অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ কেজি চিংড়ির মধ্যে একটি মাত্র স্যালমোনেলা বা প্রতি গ্রামে ১০টির বেশী E. coli-র উপস্থিতি খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা হারায়। টাইফয়েড, ডায়রিয়া বা অন্য পেটের রোগের জন্য Salmonella, E. coli প্রধান দায়ী জীবাণু।

নীচে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল

উত্তম ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য যা দরকার

হাত ধৌতকরণ- যেহেতু হাতের সংগে খাদ্যসামগ্রীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে সেকারনেই খাদ্যে বিষক্রিয়া সংক্রমণের জীবাণু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সেটাই হচ্ছে প্রধান পথ। ভালভাবে কার্যকরী হাত ধৌতকরণ খাদ্যের মাধ্যমে রোগ বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উত্তম হাত ধোয়ার মাধ্যমে খাদ্যকর্মীর হাতে গুচ্ছাকারে বিস্তারকারী Staphylococcus aureus সহ অন্যান্য জীবাণু, মলবাহিত জীবাণু, যথা- Norovirus, Shigella spp, হেপাটাইটিস A ভাইরাস, E. coli বা Salmonella typhi ইত্যাদি রোগ বিস্তারকারী খাদ্যবাহিত জীবাণু উত্তমরূপে অপসারণ করে। দুখের বিষয় হল, খাদ্যকর্মীরা প্রায়শঃই সঠিকভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে না বা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

কিভাবে হাত ধোয়া দরকার

হাত থেকে আংটি, ঘড়ি, চুড়ি ইত্যাদি খুলে ফেলুন। ঈষৎ গরম বিশুদ্ধ প্রবাহিত পানি (কমপক্ষে ৪০° সে) দ্বারা কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিন।

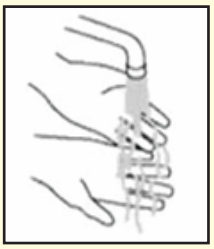

গরম প্রবাহিত পানি দ্বারা সমগ্র হাতের সাবান ধুয়ে ফেলুন।

তরল বা গুড়া সাবানের ফেনা তৈরি করে কনুই পর্যন্ত মেখে নিন। দুই আংগুলের মধ্যবর্তী ফান্দি ভালভাবে পরিষ্কার করুন। অন্ততঃ ৩০ সেকেন্ড যাবৎ উত্তম রূপে ঘষাঘষি করুন।

হাতের পানি শুকিয়ে ফেলুন। হাত শুকাতে একবার ব্যবহার্য টাওয়েল পেপার অথবা হাত শুকানো যন্ত্র (৩৫০ সেঃ - ৬০০ সেঃ) ব্যবহার করুন। টাওয়েল পেপার ব্যবহারের দ্বারা হাত মোছার সময় আরো জীবাণু অপসারিত হয় এবং পরবর্তীতে ট্যাপ বন্ধ করা বা দরজার হাতল স্পর্শ করতে এটি ব্যবহার করা যায়। কখনো এপ্রোন, পরিধেয় কাপড়, গামছা ইত্যাদি দ্বারা মুছবেন না। হাত ধোয়ার পর কোন নোংরা বস্তু স্পর্শ করলে পুনরায় উপরের ধাপসমূহ অনুসরণ করে হাত ধোয়া প্রয়োজন।

নখের নিচের ময়লা ব্রাশ দিয়ে অপসারণ করুন।

হাতের সাবান ধুয়ে ক্লোরিনযুক্ত পানি (৫০ পিপি এম) অথবা এন্টিসেপটিক ব্যবহার করে হাতে জীবাণুসংখ্যা আরো কমিয়ে আনা উচিত।

কখন হাত ধোয়া দরকার?

- টয়লেট ব্যবহারের পর দুবার হাত ধৌত করতে হবে--প্রথমবার টয়লেটের অভ্যন্তরে এবং দ্বিতীয়বার খাদ্য উৎপাদন কক্ষে প্রবেশের সময়।
- খাদ্য স্পর্শ করার পূর্বে; কারখানার খাদ্যকর্মীরা খাদ্য পরিচর্যা কক্ষে প্রবেশের সময় হাত ধুয়ে নিবেন।
- দস্তানা পরিধানের পূর্বে এবং দস্তানা পরিবর্তনের মধ্যে
- বিরতির পর পুনরায় কাজ শুরুর পূর্বে
- কাঁচা খাদ্য নিয়ে কাজ করার পর খাদ্য কক্ষে কাজ করার পূর্বে
- অপরিষ্কার বস্তু বা আসবাবপত্র স্পর্শের পর
- বর্জ্য ও আবর্জনায় হাত দেয়ার পর
- রাসায়নিক পদার্থ স্পর্শের পর
- কোন কিছু খাওয়া বা পান করার পর
- রুমাল ব্যবহার ও কাপড়ে হাত মোছার পর
- চুলে হাত দেয়া, গা চুলকানো, শরীর স্পর্শ করা, কান চুলকানো, নাক ঝাড়া, কাশি দেয়া (যদি হাত মুখ স্পর্শ করে), হাচি দেয়ার পর
- পশু বা প্রাণী স্পর্শের পর।

দস্তানা ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়

হাত যখন অতিরিক্ত নোংরা হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র হাত ধুয়ে রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষণস্থায়ী (transient) জীবাণু প্রতিরোধ সম্ভব হয় না, বিশেষ করে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যে দূষণ বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। এজন্য খালি হাতে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ না করে দস্তানা ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে হাত না ধুয়ে শুধুমাত্র দস্তানা পরে নিলেই হাত থেকে জীবাণু বিস্তার সম্পূর্ণ বাধাগ্রস্থ হয় না। এজন্য সঠিকভাবে দস্তানা ব্যবহারের জ্ঞান ও হাত ধোয়ার প্রয়োজন আছে। মনে রাখবেন:

- দস্তানা পরিধান হাত ধোয়ার বিকল্প নয়। দস্তানা পরিধানের পূর্বে সর্বদা হাত ধুয়ে নিন।
- স্যাঁতসেতে পরিবেশে ও গরমে দস্তানায় জীবাণু বৃদ্ধি পায়
- দূষিত হওয়া মাত্রই দস্তানা পরিবর্তন করা উচিত
- সঠিক সাইজের দস্তানা ব্যবহার করতে হবে
- নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট সাইজের দস্তানা ব্যবহার করতে হবে
- কাঁচা খাদ্য স্পর্শ বা অন্য কাজ করার পর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য স্পর্শের প্রয়োজন হলে নতুন দস্তানা পরিধান করুন।
- যে সমস্ত দস্তানা একবার ব্যবহার (single use) করার জন্য নির্ধারিত তা পুনরায় ব্যবহার করবেন না। দস্তানা পরিষ্কার বা জীবাণুনাশ করেও ব্যবহার করা যাবে না।
- দস্তানা ছিড়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পরিত্যাগ করে ভাল দস্তানা পরে নিন।
- হাতে কৃত্রিম নখ, নখপালিশ বা অপরিষ্কার কিছু থাকলে দস্তানা পরিধান করে যে কোন খাদ্য স্পর্শ বা পরিচর্যা করুন।

হাতের যত্ন

সঠিকভাবে হাত ধৌতকরণ পদ্ধতি অনুসরন করা ছাড়াও হাতের সার্বিক স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখা দরকার।

- হাতের নখ ছোট এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। লম্বা ও কৃত্রিম নখ সহজে পরিষ্কার করা যায় না এবং কৃত্রিম নখ সম্পূর্ণটা বা অংশবিশেষ ভেঙ্গে খাদ্যপণ্যের সাথে মিশে যেতে পারে।
- নখপালিশ ব্যবহার করবেন না। নখপালিশ ব্যবহার করলে নখের নিচে জমা ময়লা ভালভাবে দেখা যায় না; এছাড়া নখ পালিশের আস্তরণ খসে খাদ্যের সাথে মিশে যেতে পারে।

- হাতের কাটা অংশ এবং ক্ষত পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দ্বারা আবৃত রাখতে হবে। ব্যান্ডেজের কোন অংশ খাদ্যের সাথে মিশে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

খাদ্যকর্মীর অসুস্থতা

খাদ্যকর্মী নিয়োগের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং নিয়োগের পর প্রতিমাসে ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে। খাদ্যকর্মীর নিম্নলিখিত রোগের লক্ষণসমূহের বিষয়ে খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করবে, যাতে খাদ্য কর্মীর দ্বারা খাদ্য কোন প্রকার দূষিত না হয়।

বমি ও ডায়রিয়া- খাদ্য বাহিত জীবাণু *Salmonella typhi, Shigella spp, E coli* দ্বারা আক্রান্ত হলে সমগ্র পাকস্থলী ও আন্ত্রিক ব্যবস্থা দূষিত করে ফেলে এবং পায়খানার মাধ্যমে শরীর থেকে অতিমাত্রায় এ জীবাণুগুলো বেরিয়ে যায়। ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি এ জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। এ অবস্থায় খাদ্যকর্মীর করণীয়:

- কর্মস্থলে আসার আগে লক্ষণ শুরু হলে কাজে যোগদানে বিরত থাকবে।
- কাজ করা অবস্থায় শুরু হলে তাৎক্ষনিকভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করবে।
- ব্যবস্থাপক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিষয়টি জানাতে হবে।
- আরোগ্য লাভের ২৪ ঘন্টা পর কাজে যোগ দেবে।

জন্ডিস- হেপাটাইটিস-এ ভাইরাসের সাধারণ লক্ষণ হলো জন্ডিস। এ অবস্থায় খাদ্যকর্মীর করণীয়:

- চোখ ও চামড়ার বর্ণ কিছুটা হলুদাভ রং ধারণ করলে এবং শারীরিক অবস্থা ভাল অনুভূত না হলে, তাৎক্ষনিকভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করতে হবে।
- ব্যবস্থাপক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিষয়টি জানাতে হবে।
- চিকিৎসায় মনোযোগ দিতে হবে।
- ৭ দিনের বেশী জন্ডিসে ভুগে থাকলে, ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পাদন করে চিকিৎসকের ছাড়পত্র (clearence) নিয়ে নিশ্চিত হয়ে কর্তৃপক্ষ পুনরায় কাজে যোগদানের অনুমতি দিবেন।
- খাদ্যবাহিত রোগ জীবাণুর মধ্যে হেপাটাইটিস-এ একমাত্র টিকা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায়; খাদ্যকর্মীদের এ টিকা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

গলা ব্যাথা (জ্বরসহ)

- জ্বরসহ গলা ব্যাথা শুরু হলে বিষয়টি ব্যবস্থাপক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবগত করার মাধ্যমে খাদ্যকর্মীর স্বাভাবিক কাজে (খাদ্য স্পর্শ, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ইত্যাদি) বাধানিষেধ আরোপ করে অন্য বিভাগে (যেমন ক্যাশ বিভাগ) কাজে নিয়োগ করতে হবে।
- খাদ্যকর্মী যদি স্পর্শকাতর জনগোষ্ঠির (যথা হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, ৫ বছরের নীচে শিশু) জন্য কাজ করে, তবে তাকে প্রতিষ্ঠানের কোন জায়গায় কাজ করতে দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পাদন করে চিকিৎসকের ছাড়পত্র বা ক্লিয়ারেন্স নিয়ে কাজে যোগদান করতে হবে।

হাত কাটা ঘা, ক্ষত, পাঁচড়া দ্বারা আক্রান্ত হলে

- হাত কাটা ঘা ক্ষত সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবগত করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তরল পদার্থ অভেদ্য (impermeable) জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ দ্বারা ক্ষত ঢেকে দিয়ে হাতের দস্তানা পরিধান করলে খাদ্য দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, তবেই খাদ্যকর্মীকে কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করবেন; অন্যথায়, তাকে কাজ থেকে বিরত রাখবেন। এক্ষেত্রে একজোড়া দস্তানা একবারের বেশী ব্যবহার করা যাবে না।

সাধারণ স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতার খবর জানানো

খাদ্য নিয়ে যারা কাজ করেন সবদিক থেকেই তাদের স্বাস্থ্য ভাল হতে হবে; মুখের ভিতর নিরোগ থাকা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কর্মক্ষমতা পর্যন্ত। যাদের দাস্ত হচ্ছে অথবা যারা বমি হওয়ার মত কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিংবা যাদের

অন্য কোন খাদ্য-বাহিত রোগ রয়েছে তারা খাদ্যে হাত দেবেন না। তারা উর্দ্ধতন কর্মীকে তাদের অসুস্থতার কথা জানাবেন। খাদ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তারা যদি এমন কোন খাদ্য খেয়ে থাকেন যাতে বিষক্রিয়া হয়েছে বলে জানা গেছে অথবা একই বাড়ীতে কেউ যদি খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে সে বিষয়টিকেও উর্দ্ধতন কর্মীকে জানাতে হবে। যাদের মলের সংগে খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী জীবাণু বের হয় তাদেরকে ডাক্তারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থতার সার্টিফিকেট নিয়ে তারপর কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থতার সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত যাদের চর্মরোগ, ক্ষত ও সর্দি আছে এবং কান বা চোখ থেকে তরল পদার্থ নির্গত হয়, তাদেরকে কাজ থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মীদের পরিষ্কার পোষাক, দস্তানা ও গামবুট ব্যবহার
স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ সামগ্রী

নোংরা বাহিরের পোষাক পরিধান করে খাদ্যের পরিচর্যা বা প্রক্রিয়াকরণ কাজ করলে খাদ্য রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু দ্বারা দূষিত হতে পারে; এজন্য প্রতিরোধক পোষাক, যেমন মাথার টুপি, গায়ে ওভারঅল, এ্যাপ্রোন, পায়ে গামবুট, মুখে মুখবন্ধনী পরে কাজ করতে হবে।

- এ সমস্ত সামগ্রী পরিধান করে খাদ্য কক্ষের বাইরে যাওয়া যাবে না এবং প্রতিদিন ব্যবহার করার পর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে
- অলঙ্কার (জুয়েলারী) দ্রব্যাদি যথা আংটি, কানের দুল, গলার চেইন, ঘড়ি, চুড়ি ইত্যাদি না পরে এবং প্রসাধনী ব্যবহার না করে কর্মস্থলে কাজ করতে হবে।
- ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র যেমন চশমা, কলম, নোটবুক ইত্যাদি সংগে নিয়ে খাদ্যকক্ষে প্রবেশ করা যাবে না।

প্রতিরোধক পোষাক

যারা খোলা খাদ্যসামগ্রী নাড়াচাড়া করেন তাদের ব্যক্তিগত পোষাকের উপর একটি বাড়তি পোষাক পরা অবশ্যই উচিত। এগুলো হালকা রংয়ের হওয়া ভাল এবং বাইরের দিকে কোন পকেট থাকবে না। সাধারণ বোতাম ব্যবহার না করে টিপ বোতাম ব্যবহার করা ভাল। যে ধরনের কাজ সে অনুযায়ী যথাযোগ্য প্রতিরোধক পোষাক পরা উচিত এবং সেটা ব্যক্তিগত পোষাককে পুরোপুরি ঢেকে রাখবে; সার্টের হাতা অথবা জাম্পার বেরিয়ে থাকবেনা। মানানসই জুতা পরা উচিত যাতে পা পিছলে না যায় এবং পাগুলোকে রক্ষা করে।

কর্মীদের এটা জানা উচিত যে, প্রতিরোধক পোষাক সংক্রমণ থেকে খাদ্যকে রক্ষা করার জন্য, তাদের পোষাক পরিষ্কার রাখার জন্য নয়। নিত্যকার পোষাকে আরও অন্যান্য কিছুর মধ্যে ধূলা, পশুপাখির লোম, পালক এবং পশমী কাপড়ের আঁশ, ইত্যাদি থাকে যা খাদ্যের মধ্যে মিশে যেতে পারে। প্রতিরোধক পোষাক খাদ্য তৈরির জায়গার বাইরে, কাজে আসা যাওয়ার সময় বা দুপুরে ছুটির সময় বা খেলার সময় ব্যবহার করা চলবে না। উপযুক্ত লকারে রাখার ব্যবস্থা না থাকলে বাইরের পোষাক এবং ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র নিয়ে খাদ্য তৈরির ঘরে যাওয়া যাবে না। টয়লেট সংলগ্ন স্থানে প্রতিরোধক পোষাক ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

খাদ্যকর্মী এবং বহিরাগত দর্শনার্থীরা খাদ্য পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রবেশের পূর্বে তাদের দ্বারা সংগঠিত খাদ্য, উপাদান, মোড়ক সামগ্রী ও খাদ্য-স্পর্শী তলের সম্ভাব্য দূষণ প্রতিরোধ বা হ্রাস করার জন্য বহির্বাস (appron), জুতা এবং মস্তকাবরণ (musk) পরিধান করে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। মানুষের মাধ্যমে খাদ্য, উপাদন, মোড়ক সামগ্রী অথবা খাদ্য-স্পর্শী তলে অনুজীব বা এ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তু সাধারণত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানান্তর হওয়ার করণে দূষণ সংযোগ (cross-contamination) ঘটে থাকে। দূষণ সংযোগ অস্বাস্থ্যকর পোশাক বা জুতা (ময়লা জামাকাপড়) থেকে হতে পারে। দস্তানা এবং বর্হিবাস সাধারণত আসবাবপত্র, টেবিল, রাখার পাত্র ইত্যাদির ন্যায় খাদ্য স্পর্শী পৃষ্ঠতল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিরাপদ এবং উচ্চ মানের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য, দস্তানা (gloves), বহির্বাস (appron) এবং অন্যান্য পোষাক যা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে খাদ্যের সংস্পর্শে আসে তা নিয়মিত ধৌত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জিনিষগুলি প্রতিবার ব্যবহারে পরে পরিষ্কার এবং সংক্রমণমুক্ত করা উচিত।

দস্তানা, বহির্বাস এবং বুট জুতা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

- ⇩ প্রথমে ৩০-৫০ পিপিএম ক্লোরিন পানি দিয়ে দস্তানা, বহির্বাস (appron) ধুয়ে ফেলুন;
- ⇩ পুনরায় সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন;
- ⇩ ৩০০ পিপিএম ক্লোরিন দ্রবণের মধ্যে ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন;
- ⇩ আইটেমগুলো ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে প্রতিস্থাপন করুন।

সুরক্ষামূলক এই পোষাক-পরিচ্ছদ শুধুমাত্র পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় ব্যাবহার করতে হবে; তা বাইরে নিয়ে আসা বা ব্যবহার করা উচিত নয়।

সুরক্ষা পোশাক শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত; যদি সুরক্ষামূলক পোষাক নিয়মিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের আগে জরাজীর্ণ বা ছিদ্র সৃষ্টি হয় বা ছিড়ে যায় তবে সেগুলো আরও কিছু কাল ব্যবহারের জন্য মেরামত করা উচিত; মেরামত সম্ভব না হলে, সগুলো প্রতিস্থাপন করতে হবে। যদি সুরক্ষামূলক পোষাক রাসায়নিক বা খাদ্য রং দ্বারা দূষণ হয়ে পরে যা খাদ্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে, সে ক্ষেত্রে এগুলো অপসারন বা ধ্বংস করা আবশ্যক। দায়িত্বে নিয়োজিত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা দস্তানা এবং বহির্বাস (gloves and aprons) চেক করে দেখবে যে তা জরাজীর্ণ বা তাতে কোন ছেড়া-ফাটা সৃষ্টি হয়েছে কিনা এবং এরূপ ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিস্থাপন করতে হবে। খাদ্যকর্মীরা তাদের নিজস্ব বুট জুতা চেক করে দেখবে যে, তা ঠিক আছে কিনা- কোনরূপ ব্যবহারের অযোগ্য হলে তা প্রতিস্থাপন করার জন্য কতৃপক্ষকে জানাবে।

যখন দস্তানা এবং পোশাকাদি ব্যবহার করা হয় না তখন সেগুলো ময়লা জামাকপড় থেকে আলাদা শুষ্ক, পরিষ্কার জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। পোশাক এবং দস্তানা (gloves) ক্রয়, পরিষ্কারকরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানের একটি নীতিমালা থাকা উচিত। এই বস্তুগুলো এমন জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে যেখানে এগুলোর চারিদিকে বাতাস সঞ্চালনের মাধ্যমে শুকানো প্রক্রিয়া সহজতর হয়। যদি এই বস্তুগুলো স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে গুটান বা স্তুপীকৃত অবস্থায় গাদা করে রাখা হয়, তাহলে সংরক্ষণকালে উপরিভাগে প্রচুর ব্যাক্টেরিয়া জন্মাতে পারে।

দস্তানা, বহির্বাস (aprons) এবং অন্যান্য পোষাক সঠিকভাবে তাদের উদ্দীষ্ট ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা এবং টেকসই উপকরণ দ্বারা নির্মাণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, অশোষক পদার্থ (প্লাস্টিক বা রাবার) দ্বারা তৈরি দস্তানা ব্যবহার করা উচিত। দস্তানায় বিদ্যমান ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে আধোয়া হাত থেকে ব্যাক্টেরিয়া স্থানান্তরিত হয়ে দস্তানার পৃষ্ঠদেশে চলে এসে খাদ্য পণ্যে দূষণ সংযোগ ঘটাতে পারে।

সুরক্ষামূলক পোষাক (হেয়ার নেট, টুপি, মাস্ক, বহির্বাস, দস্তানা, বুট)

ওভার অল/লম্বা কোট (overall/long coat): ওভার অল/লম্বা কোট সাধারণত তুলোর সঙ্গে নাইলন ফ্যাব্রিক মিশ্রিত করে তৈরি করা হয় যাতে এগুলো হালকা ও সহজে ধোয়া যায়। ফ্রিজিং এবং প্যাকেজিং বিভাগের শ্রমিকদের জন্য নাইলন উপকরণ দ্বারা তৈরি ওভার অল/লম্বা কোট সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় কারণ এগুলি সুতার তৈরি পোষাকের তুলনায় উষ্ণতর এবং পানি প্রতিরোধী। এগুলিতে কোন পকেট বা বোতাম না থাকা উচিত; কারণ পকেট থেকে কোন জিনিস বা বোতাম খুলে খাদ্য পণ্যের উপর পরতে পারে।

হেয়ারনেট (hairnet): এগুলো সহজে ধৌতযোগ্য নরম নেটের মত ফ্যাব্রিক দ্বারা তৈরি করা হয়। মাথার সমস্ত চুল হেরার নেটের মধ্যে আবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

টুপি: এগুলো সাধারণত নাইলন ফেব্রিক দ্বারা তৈরি করা হয়। টুপির সামনের প্রান্ত একটু কঠিন পদার্থ দ্বারা এবং কান ঢাকার অংশ দুটি শ্রবন নিশ্চিত করার জন্য নেটের ন্যায় ফেব্রিক দ্বারা তৈরি করা হয়। এছাড়াও ঘাড়ের পিছন ও সামনের দিক আবৃত রাখার জন্য টুপির সাথে সংযুক্ত অংশ থাকে।

মাস্ক (masks): এটা সুতার (তুলার) কাপড় দিয়ে তৈরি হয়, কিন্তু সহজ করে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করার জন্য সুতা পর্যাপ্ত হালকাভাবে বুনা হয়। পুরো মুখ এবং নাক মাস্ক দ্বারা আচ্ছাদন করা আবশ্যক।

এ্যাপ্রন (apron): এগুলো নরম প্লাস্টিক উপাদানের মসৃণ পৃষ্ঠতল দিয়ে তৈরি এবং প্রায়শই উজ্জ্বলভাবে রঙ্গিন যাতে ময়লা এবং দাগ সহজে প্রদর্শন করে।

দস্তানা (gloves): এগুলো নরম রাবার উপাদান দ্বারা তৈরি হয়। অন্তঃস্থ পৃষ্ঠতল পরিমিতরূপে আঠালো প্রকৃতির যাতে খাদ্যকর্মী খাদ্য বা অন্যান্য জিনিসপত্র সহজে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়।

বুট (boots) জুতা: সাধারণত এগুলো দুই ধরনের। এক ধরনের বুট জুতা যেগুলো সম্পূর্ণরূপে প্লাস্টিক উপাদান দ্বারা তৈরি এবং অন্য ধরনের বুট জুতা যা প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি তবে ভিতরদিকে একটি টেক্সটাইল আবরণ থাকে।

খাদ্যকর্মীর অস্বাস্থ্যকর বদ অভ্যাসজনিত কাজ

নিম্নলিখিত বদ অভ্যাস অনুশীলন থেকে খাদ্যকর্মীকে বিরত থাকতে হবে:

- খাদ্য কক্ষে কোনরূপ খাওয়া-দাওয়া এবং পান করা নিষেধ; বিড়ি, সিগারেট, চুইংগাম ইত্যাদি কোন কিছু খাওয়া যাবে না;
- থুতু, কফ ফেলা যাবে না;
- খাদ্য সামনে নিয়ে হাচি বা কাশি দেয়া যাবে না;
- নখ খাটো রাখতে হবে; কার্য সম্পাদনের সময় চুল, মুখমন্ডল ও শরীরে কোথাও স্পর্শ করা যাবে না;
- কাজের সময় হট্টগোল বা চিৎকার চেচামেচি বা গান গাওয়া যাবে না;
- অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না;
- মোড়কের কাগজ উল্টানো বা তোলার আগে আংগুলে থু থু লাগানো যাবে না।

নাক, মুখ এবং কান

বয়স্করা ৪০% 'স্ট্যাফাইলোকক্কাই' জীবাণু নাকে এবং মুখে বহন করেন। হাঁচি এবং কাশির ছিটা বেশ কিছুদুর পর্যন্ত সংক্রমণ বহন করতে পারে এবং যাদের সর্দি আছে তাদেরকে খোলা খাদ্য ধরতে দেওয়া উচিৎ নয়। রুমাল ব্যবহার না করে একবার ব্যবহার করার মত 'ডিস্পোজেবল' কাগজের টিস্যু ব্যবহার করা উচিৎ। নাক খোঁটা এবং চুলকানো যাবেনা। যেহেতু মুখের মধ্যে স্ট্যাফাইলোকক্কাস থাকতে পারে তাই খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যারা কাজ করেন তারা কাজের সময় পান খাওয়া, গাম চোষা এবং কোন কিছু পান করতে পারবেন না। শোভনতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য না হওয়া ছাড়াও থুতু স্বভাবতই খাদ্যে সংক্রমণ সৃষ্টি করে তাই যত্রতত্র থুতু ফেলা যাবেনা। কান, চোখ এবং নাক থেকে নির্গত রস খাদ্যসামগ্রীকে সংক্রমিত করতে পারে এবং যেসব কর্মী এই ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন তাদেরকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়টি জানাতে হবে। পুনরায় কাজে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে ডাক্তারের কাছ থেকে সুস্থতার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে।

কাটা, ফোড়া, আংগুলহাড়া এবং দূষিত গুটি

কাটা, গুটি এবং দূষিত ক্ষত জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আদর্শ জায়গা। ক্ষতিকর জীবাণু এবং রক্তের দ্বারা খাদ্যসামগ্রীর সংক্রমণ রোধ করতে হলে ঐ সব ব্যাধিগ্রস্থ জায়গা পানি-নিরোধক পট্টি দিয়ে আবৃত করতে হবে। নীল অথবা সবুজ রংয়ের পটি ব্যবহার করলে ভাল হয়; কারণ সেগুলো পড়ে গেলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। আংগুল কেটে গেলে অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে আংগুলের টুপি (ফিংগারস্টল্স) ব্যবহার করা যেতে পারে।

অলংকার এবং সুগন্ধি

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের পক্ষে কানের দুল, ঘড়ি, পাথর-বসানো আংটি বা ব্রোচ ব্যবহার করা উচিৎ নয়, কারণ ঐগুলোর মধ্যে ময়লা এবং জীবাণু থাকতে পারে। উপরন্ত পাথর ও ধাতুর ছোট টুকরা খাদ্যের মধ্যে চলে যেতে পারে এবং তার ফলে ক্রেতার অভিযোগ আসবে। খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের পক্ষে কড়া সুগন্ধি বা আফটারশেভ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে খাদ্যে এগুলোর গন্ধ সংক্রমিত হতে পারে।

চুল

চুল এবং চুলের খুস্কি সব সময়েই পড়ে এবং এই দুইয়ের ফলে খাদ্য সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া মাথার উপর চুলে

ও চামড়াতে অনেক সময় ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। চুল সব সময় সাবান অথবা শ্যাম্পু দিয়ে পরিস্কার করা উচিত। খাদ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের উচিত চুল পুরোপুরি ঢেকে যায় এমনভাবে মাথায় আবরণ পরা, যেমন মাথায় চুলের জাল এবং টুপি পরা। শুধুমাত্র পোষাক পরিবর্তন কক্ষে চুল আচড়ানো এবং মাথার আবরণ ঠিক করা যাবে, প্রতিরোধক পোষাক (এ্যাপ্রোন) পরে এগুলো করা যাবে না; কারণ তা না হলে কাঁধে চুল পড়বে এবং পরিশেষে তা খাদ্যের মধ্যে চলে যাবে।

ধূমপান

খাদ্য তৈরির ঘরে অথবা খোলা খাবার নাড়াচাড়া করার সময় নস্যি এবং তামাকজাতীয় দ্রব্যসহ বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, পাইপ ব্যবহার করা বে-আইনী। এটা শুধু বিড়ি বা সিগারেটের মাথা থেকে খাদ্যে সংক্রমণ রোধ করার জন্যই নয়; তার আরো কারণ হচ্ছে:

১। লোকে ধূমপান করার সময় ঠোঁটে আংগুল লাগায় এবং তাতে আংগুলের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্যে চলে যেতে পারে,

২। ধূমপান করলে কাশি লাগার সম্ভাবনা থাকে এবং কাশির ছিটা থেকে খাদ্যে সংক্রমণ হতে পারে,

৩। মুখের লালা যুক্ত সিগারেটের শেষ অংশ কাজের টেবিলের উপর রাখার সমূহ সম্ভাবনা থাকে,

৪। যারা ধূমপান করেন না তাদের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

খাদ্য কর্মীর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য

সুস্থসবল দেহের অধিকারী হতে হবে। অবশ্যই সংক্রমণ ব্যাধিমুক্ত হতে হবে। খাদ্য কর্মীর হাত, ঘাম, চুল, নিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা খাদ্য দূষিত হয়। এজন্য তাকে কিছু প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হবে, যথা-

- নিয়মিত গোসল করা (সাবান ব্যবহার করা)
- সপ্তাহে অন্তত দু'বার (সাবান বা শ্যাম্পু দ্বারা) চুল পরিষ্কার করা; কাজে যোগদানের পূর্বে চুল শক্ত করে বাধা (মহিলাদের ক্ষেত্রে)
- প্রতিদিন নখ পরিষ্কার করা

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষা

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যারাই কাজ করেন, খাদ্য সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। এতে নিশ্চিত করা যাবে তারা এ বিষয়গুলো জানেন যে, নিম্নমানের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পালনের বিপদগুলি কি এবং এতে করে যেসব ঘটনা থেকে খাদ্যে বিষক্রিয়ার বিস্তার ঘটে তার ধারাবাহিকতা কি করে বন্ধ করতে হয়। হ্যাসাপ পণ্যের গুণগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি আধুনিক পদ্ধতি। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত আমাদের মাংসের চাহিদা থাকলেও বিভিন্ন সময়ে রপ্তানীকৃত মাংসে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবানু, এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক, নোংরা ও ময়লা বস্তু এবং বিভিন্ন অপদ্রব্যের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের মাংসকে সাধারণত নিম্নমানের হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

পাঠ - ১১
হ্যাসাপ পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ

হ্যাসাপ কি? হ্যাসাপ 'হ্যাজার্ড এনালাইসিস্ ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট' এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

বাংলায় এর অর্থঃ 'বিপদ বিশ্লেষণে সঙ্কটপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিন্দু'

হ্যাসাপ-এর ইতিহাস

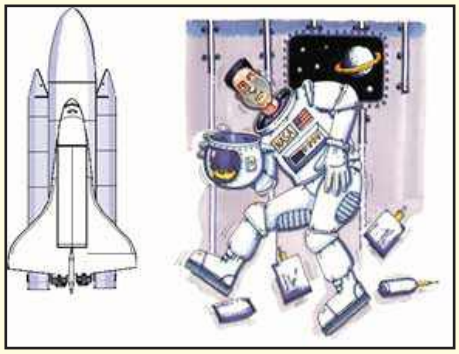

ইতোপূর্বে অনেকেই হয়তো হ্যাসাপ শব্দটির সাথে পরিচিত ছিলেন না কিন্তু ইদানিং খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িতরা ছাড়াও অন্যান্যরাও শব্দটি হরহামেশাই শুনে থাকেন এবং শব্দটি যে বেশ গুরুত্ব বহন করে তা উপলব্ধি করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি কোন নতুন শব্দ যেমন নয় তেমনি কোন নতুন কনসেপ্ট বা ধারণাও নয়ঃ

- 'ফেলিউর মোড এ্যান্ড ইফেক্ট এনালাইসিস্' নামক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি থেকে মূল ধারণাটি নেয়া হয়েছে।
- ষাটের দশকের শুরুতে আমেরিকা যুক্তরাষ্টের পিলসবুরী কোম্পানী নভোচারীদের জন্য খাদ্য তৈরির সময় সর্বপ্রথম হ্যাসাপ কনসেপ্ট ব্যবহার করেছিল।
- ১৯৭১- প্রথম 'আমেরিকান ন্যাশনাল কনফারেন্স ফর ফুড প্রটেকশন'-এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয়।
- ১৯৭৩- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ হ্যাসাপ- কে 'লো এসিড ক্যানড ফুডস'-এ সফলভাবে প্রয়োগ করে।
- ১৯৯৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্টে এটি রেগুলেশানে পরিণত হয়। ১৯৯৫ সালের পর থেকে সারা বিশ্বে 'স্টেট অব দি আর্ট টেকনোলোজী' হিসেবে হ্যাসাপ-এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় (খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী-বেসরকারী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে)।
- ১৯৯৭- বাংলাদেশে 'পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩' এ হ্যাসাপকে 'কোয়ালিটি এ্যাসিউরেন্স প্রোগ্রাম' বা 'কোয়াপ' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হ্যাসাপ-এর সুবিধাসমূহ

'হ্যাসাপ' উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের সকল ধাপকে পর্যায়ক্রমে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর ধাপ সংশ্লিষ্ট সকল হ্যাজার্ডকে সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কেবলমাত্র সেই ধাপকে চিহ্নিত করে যেগুলো উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত পণ্যের নিরাপত্তার জন্য ক্রিটিক্যাল। এর ফলে উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে সুনির্দিষ্টভাবে কেবলমাত্র ঐ সকল ধাপে (সিসিপি) কেন্দ্রিভূত করতে পারে যে ধাপগুলো প্রকৃতপক্ষেই পণ্যের নিরাপত্তার সাথে যুক্ত। অর্থাৎ পণ্যের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় প্রক্রিয়াকরণের এমন ধাপে অনর্থক নিয়ন্ত্রণ আরপের ফলে সম্পদ, প্রচেষ্টা এবং সময়ের যে অপচয় হয় হ্যাসাপ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা যেমন রোধ করা সম্ভব হয় তেমনি একই সাথে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের সর্বাধিক নিরাপত্তাও অর্জিত হয়।

- ক্রমানুসারী, সংগতিপূর্ণ এবং যুক্তি-নির্ভর পদ্ধতি।
- অধিক প্রতিরোধমূলক, প্রতিক্রিয়ামূলক নয় এবং-কুপ্রভাব মুক্ত।
- অধিক মুনাফা নিশ্চিত করে।
- নিয়ন্ত্রণের সামর্থ ও প্রচেষ্টাকে সঙ্কটময় স্থানে নিবদ্ধ করে।
- বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দুর্বলতাকে দূর করে।
- বিদ্যমান আইনসমূহকে মেনে চলে।
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।
- নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপর্ক্ষ এবং প্রক্রিয়াকরণকারীর মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখে।

হ্যাসাপ পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বশর্ত

মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে হ্যাসাপ পদ্ধতির প্রয়োগ বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। হ্যাসাপ পদ্ধতিকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাষ ক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে শুরু করে আহরণ, পরিবহণ, বিতরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানীর সকল পর্যায়ে এটিকে প্রয়োগ করতে হবে। হ্যাসাপ একটি স্ব-পরীক্ষণ পদ্ধতি অর্থাৎ উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াকরণকারী বা সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসার স্বার্থেই পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাসাপ পদ্ধতিকে নিজেই প্রয়োগ করবেন। হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে তাই অবশ্যই আন্তরিক এবং এবিষয়ে অংগিকারবদ্ধ হতে হবে। নিচে পূর্বশর্তগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হ্যাসাপ বাস্তবায়নে আন্তরিক এবং এ বিষয়ে অংগীকারবদ্ধ হতে হবে।
- চাষ ক্ষেত্র হতে রপ্তানী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে হ্যাসাপ প্রয়োগের মানসিকতা থাকতে হবে।
- সাধারণ ও জটিল পণ্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।
- যে কোন ধরনের ফুড হ্যাজার্ড বিশ্লেষণ করতে হবে, যেমন- জীবগত, রাসায়নিক ও পদার্থগত।
- সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও কর্মোপযোগী হতে হবে।
- সম্পৃক্ত সকলের হ্যাসাপ-এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। সফল প্রশিক্ষণ হ্যাসাপ বাস্তবায়নের প্রধান পূর্বশর্ত।

বিঃদ্রঃ হ্যাসাপ সম্পর্কিত দায়িত্ব

'হ্যাসাপ প্লান তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অবশ্যই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার, পক্ষান্তরে রেগুলেটরী এজেন্সী বিষয়টিকে সহজতর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে।'
'ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরী কমিটি অন মাইক্রোবায়োলোজীক্যাল ক্রাইটেরিয়া ফর ফুডস্, ইউএসএ' জুন ১৯৯৩।

হ্যাসাপ-এর বিভিন্ন সংগা

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি 'হ্যাজার্ড এনালাইসিস্ ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টস্' এর সংক্ষিপ্ত রূপই হ'ল 'হ্যাসাপ' কিন্তু হ্যাসাপ আসলে কি তা ভালভাবে বুঝতে হ'লে এর বিভিন্ন সংগার বিষয়ে অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখানে হ্যাসাপ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরূত্বপূর্ণ সংগার উল্লেখ করা হ'ল:

হ্যাসাপ পদ্ধতি- এটি খাদ্যের প্রাথমিক উৎপাদন থেকে চূড়ান্ত ব্যবহার পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সকল পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপত্তার বিষয়টির সর্বাধিক উন্নয়নের বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং পর্যায়ক্রমিক পন্থা যা খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য গুরূত্বপূর্ণ হ্যাজার্ড/হ্যাজার্ডগুলোকে চিহ্নিত, মূল্যায়ন এবং তার নিয়ন্ত্রণ করে।
হ্যাসাপ প্লান- হ্যাসাপ-এর মূলনীতি নির্ভর এমন একটি লিখিত পরিকল্পনা বা ডকুমেন্ট যা একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া বা প্রক্রিয়াকরণ ধারার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য যে সমস্ত কার্যপ্রণালীকে অনুসরণ করতে হবে তার একটি সংগঠিত এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনা প্রদান করে।
প্রসেস ফ্লো- যুক্তিসংগত 'ধাপসমূহের' সমন্বিত বিন্যাস; প্রত্যাশিত চূড়ান্তখাদ্য পণ্য তৈরির জন্য ধারাবাহিকভাবে বা ক্রমানুসারে যার মাধ্যমে কাঁচামালের প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়।
ফ্লো ডায়াগ্রাম- প্রসেস ফ্লো-এর একটি রেখ-চিত্রিক উপস্থাপনা।
প্রক্রিয়াকরণ ধাপ- পরস্পর সদৃশ বা সম্পূরক পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের একটি সমষ্টি যা একটি সময়ের কোন খাদ্যকে (অথবা তার কাঁচামালসমূহের) অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সদৃশ অন্য একটি অবস্থায় বা ভিন্ন একটি অবস্থায় নিয়ে যায়।

হ্যাজার্ড বা বিপদ- যে কোন জীবগত, রাসায়নিক বা পদার্থগত বিষয় যা কোন খাদ্যবস্তুকে খাওয়ার অনুপোযুক্ত করে ভোক্তাকে অসুস্থ করতে পারে।

হ্যাজার্ড এনালাইসিস বা বিপদ বিশ্লেষণ- হ্যাজার্ড এনালাইসিস, হ্যাজার্ড এবং হ্যাজার্ডের উপস্থিতির জন্য সৃষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং তার ব্যাখ্যার একটি পদ্ধতি। হ্যাজার্ড এনালাইসিস করা হয় কোন কোন হ্যাজার্ডগুলো খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য গুরূত্বপূর্ণ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং হ্যাসাপ প্লানে সেগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা ও তার প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

কন্ট্রোল পয়েন্ট বা নিয়ন্ত্রণ বিন্দু- কোন অবস্থান বিন্দু, ধাপ বা কর্মপ্রণালী যেখানে জীবগত, পদার্থগত বা রাসায়নিক বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা- এমন কিছু কার্যব্যবস্থা বা কার্যক্রমের প্রয়োগ যা একটি হ্যাজার্ড বা তার সম্ভাব্য কারণকে প্রতিরোধ, নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য স্তরে কমিয়ে আনে।

ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট বা সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ বিন্দু- ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট বা সিসিপি বা সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ বিন্দু, এমন একটি অবস্থান বিন্দু, ধাপ বা কর্মপ্রণালী যেখানে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত হ্যাজার্ডকে প্রতিরোধ, নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য স্তরে কমিয়ে আনা যায়।

ব্যাখ্যা

১। হ্যাসাপ 'ঝুঁকি শূণ্য' কোন পদ্ধতি নয়। হ্যাসাপকে মূলত ডিজাইন করা হয়েছে খাদ্যে-নিরাপত্তা হ্যাজার্ডকে প্রশমিত করার জন্য।

২। কন্ট্রোল পয়েন্ট ঐ সমস্ত পয়েন্ট বা ধাপ যেখানে মান সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, কন্ট্রোল পয়েন্ট ঐ সমস্ত পয়েন্ট যেখানে হ্যাসাপ রেগুলেশনের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আর ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট ঐ সমস্ত পয়েন্ট যেখানে খাদ্য-নিরাপত্তা সংক্রান্ত হ্যাজার্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

সিসিপি ডিসিশান ট্রি বা সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ বিন্দু নির্ধারণী বৃক্ষ- কোন নিয়ন্ত্রণ বিন্দু সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ বিন্দু কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন-ক্রমই সিসিপি ডিসিশান ট্রি।

ক্রিটিক্যাল লিমিট বা সঙ্কট সীমা- ক্রিটিক্যাল লিমিট বা সঙ্কটসীমা একটি মানদন্ড; সিসিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই মানদন্ড অবশ্যই পূরণ করতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এটি জীবগত, রাসায়নিক বা পদার্থগত বিষয়ের একটি সর্বোচ্চ এবং/বা সর্বনিম্ন মানদন্ড। কোন একটি সিসিপিতে খাদ্য-নিরাপত্তা সংক্রান্ত হ্যাজার্ডকে প্রতিরোধ, নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য স্তরে কমিয়ে আনার জন্য সিসিপি সংশ্লিষ্ট জীবগত, রাসায়নিক বা পদার্থগত বিষয়গুলিকে উক্ত মানদন্ড পূরণের মাধ্যমে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মনিটরিং প্রণালী- কোন একটি সিসিপি নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপসমূহের একটি পরিকল্পিত অনুক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ভবিষ্যতে ভেরিফিকেশনে ব্যবহারের জন্য নির্ভুল রেকর্ড উপস্থাপন করাকেই মনিটরিং প্রণালী বলা হয়।

কারেক্টিভ এ্যাকশান বা সংশোধন ব্যবস্থা- একটি ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টে কোন ক্রিটিক্যাল লিমিটের বিচ্যুতি দেখা দিলে যে সমস্ত উপায়ে তা সংশোধন করা হয় তাকে কারেকটিভ্ এ্যাকশান বা সংশোধন ব্যবস্থা বলা হয়।

টার্গেট লেভেল বা লক্ষ্যমাত্রা- একটি প্রতিষ্ঠিত মাত্রা বা মান যা ইতোপূর্বে এটা প্রমাণ করছে যে, এই মাত্রা বা মান কোন সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ বিন্দুর হ্যাজার্ডকে প্রতিরোধ বা নির্মূল বা একটি গ্রহণযোগ্য স্তরে কমিয়ে আনবে।

টলারেন্স লিমিট বা সহ্য সীমা- লক্ষ্যমাত্রা এবং সঙ্কট সীমার মধ্যবর্তী মাত্রার পরিসীমাকেই সহ্য সীমা বলা হয়।

ভ্যালিডেশন- ভ্যালিডেশন ভেরিফিকেশনের একটি অংশ যা তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এটি নির্ধারণ করে যে, হ্যাসাপ প্লান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে তা খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত হ্যাজার্ডকে কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ কোন হ্যাসাপ প্লান যে সঠিক ভাবে কাজ করবে ভ্যালিডেশন সে ব্যাপারে বৈধতা প্রদান করে।

ভেরিফিকেশন- হ্যাসাপ প্লানটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত এবং প্লানটি যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে-এ বিষয় দু'টিকে ভ্যালিডেট করার জন্য মনিটরিং ব্যতীত বিভিন্ন পদ্ধতি, কার্যপ্রণালী, পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের প্রয়োগই ভেরিফিকেশন।

হ্যাসাপ-এর সাতটি মূলনীতি

১৯৯২ সালে 'ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরী কমিটি অন মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া ফর ফুডস্, ইউএসএ' হ্যাসাপের সাতটি মূলনীতি গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে মূলনীতিগুলোতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিচে হ্যাসাপ-এর সাতটি মূলনীতি উল্লেখ করা হ'ল-

১। হ্যাজার্ড এনালাইসিস্ করুন এবং একই সাথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা চিহ্নিত করুন।
২। প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (পয়েন্টগুলো) চিহ্নিত করুন।
৩। ক্রিটিক্যাল লিমিট প্রতিষ্ঠা করুন।
৪। প্রতিটি সিসিপি মনিটর করুন।
৫। কারেকটিভ্ এ্যাকশান (সংশোধন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করুন।
৬। ভেরিফিকেশন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করুন।
৭। রেকর্ড ও লিখিত প্রমাণসমূহ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

বি:দ্রঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্ব স্ব প্রয়োজনে হ্যাসাপকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করে একে বিভিন্ন নামে উপস্থাপন করলেও প্রকৃতপক্ষে অদ্যাবধি মূলনীতিগুলোর গুনগত কোন পরিবর্তন হয়নি।

মূলনীতি সাতটির ব্যাখ্যা

মূলনীতি ১। হ্যাজার্ড এনালাইসিস্ করুন এবং একই সাথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা চিহ্নিত করুন

প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার সকল ধাপের সমন্বয়ে একটি **'প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম'** তৈরি করতে হবে। উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার ঐ সমস্ত ধাপের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাজার্ডগুলো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কাঁচামাল গ্রহণ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্যের বাজারে ছাড়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য হ্যাজার্ডের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। সকল সম্ভাব্য বিপদের ইঙ্গিতপূর্ণ হ্যাজার্ডগুলোকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং একইসাথে হ্যাজার্ডের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থারও বর্ণনা করতে হবে।

মূলনীতি ২। প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (পয়েন্টগুলো) চিহ্নিত করুন

বিদ্যমান হ্যাজার্ডসমূহের কারণে কোন একটি প্রক্রিয়াকরণ ধাপ ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টে পরিণত হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য **'সিসিপি ডিসিশান ট্রি'** (বা অন্য যে কোন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি) ব্যবহার করতে হবে।

মূলনীতি ৩। ক্রিটিক্যাল লিমিট প্রতিষ্ঠা করুন

প্রতিটি হ্যজার্ড (যা একটি প্রক্রিয়াকরণ ধাপকে সিসিপি-তে পরিণত করে) যে নিয়ন্ত্রণে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য মানদন্ড বা মাত্রা নির্দিষ্ট করতে হবে। কোন একটি সিসিপিতে খাদ্য-নিরাপত্তা সংক্রান্ত হ্যাজার্ডকে প্রতিরোধ, নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য স্তরে কমিয়ে আনার জন্য সিসিপি-সংশ্লিষ্ট জীবগত, রাসায়নিক বা পদার্থগত বিষয়গুলিকে উক্ত মানদন্ড পূরণের মাধ্যমে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মূলনীতি ৪। প্রতিটি সিসিপি মনিটর করুন

চিহ্নিত হ্যাজার্ডের নিয়ন্ত্রণ অবস্থা মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। মনিটরিং-এ প্রাপ্ত রেকর্ডসমূহ কড়া 'রেকর্ড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'- এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে।

মূলনীতি ৫। কারেকটিভ্ এ্যাকশান (সংশোধন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করুন

মনিটরিং ফলাফল প্রতিষ্ঠিত ক্রিটিক্যাল লিমিটের কোন বিচ্যুতি নির্দেশ করলে কি সংশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখতে হবে, যেন যথাসময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেয়া যায়।

মূলনীতি ৬। ভেরিফিকেশন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করুন

হ্যাসাপ পদ্ধতি যে সঠিকভাবে কাজ করছে তা ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মূলনীতি ৭। রেকর্ড ও লিখিত প্রমাণসমূহ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন

হ্যাসাপ-এর মূলনীতি এবং এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাবলী ও নির্দিষ্ট রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া হ্যাসাপ পদ্ধতি অর্থহীন।

হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হ্যাসাপ খাদ্যের নিরাপত্তার বিষয়টির সর্বাধিক উন্নয়নের বিজ্ঞান ভিত্তিক, সুসংগঠিত এবং পর্যায়ক্রমিক পন্থা। সংগত কারণেই তাই হ্যাসাপকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হয়। নিচে ধাপগুলি উল্লেখ করা হ'ল এবং পরবর্তীতে প্রত্যেকটি ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

০১। কর্মপরিধি নির্ধারণ করা।
০২। হ্যাসাপ টিম নির্বাচন করা।
০৩। পণ্যের বর্ণনা প্রদান।
০৪। প্রত্যাশিত ব্যবহার চিহ্নিত করা।
০৫। প্রোসেস ফ্লো-ডায়াগ্রাম তৈরি করা।
০৬। ফ্লো-ডায়াগ্রামের যথার্থতা যাচাই করা।
০৭। হ্যাজার্ড এনালাইসিস্ করা এবং প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ নির্ধারণ করা।
০৮। ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (সিসিপি) নির্ধারণ করা।
০৯। ক্রিটিক্যাল লিমিট বা সঙ্কট সীমা প্রতিষ্ঠা করা।
১০। সিসিপিসমূহের মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
১১। কারেকটিভ্ এ্যাকশান বা সংশোধণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
১২। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার যথার্থতা যাচাই করা।
১৩। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।
১৪। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা।

হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহের ব্যাখ্যা

০১। কর্মপরিধি নির্ধারণ করা

সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে-

- পণ্য, কোন্ ধরনের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা কার্যক্রম হ্যাসাপ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।
- হ্যাজার্ড পর্যবেক্ষণের ব্যাপ্তি; জীবগত, রাসায়নিক, পদার্থগত।
- খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়, মান সম্পর্কিত বিষয়, নাকি উভয়ই।
- কোন্ পর্যায়ে খাদ্য পণ্যকে নিরাপদ মনে করা হচ্ছে, সর্বশেষ ভোক্তার ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ ইত্যাদি।
- নিরাপত্তা বিষয়ক, সহজ কর্ম পরিধি।

০২। হ্যাসাপ টিম নির্বাচন করা

- টিমটি হবে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি বা বহুমাত্রিক।
- বিশেষজ্ঞ/অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনঃ
    - রক্ষণাবেক্ষণ,
    - উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ,
    - স্যানিটেশান,
    - মান নিয়ন্ত্রণ/মান নিশ্চিতকরণ,
    - পরীক্ষাগার এবং প্রয়োজনে অন্যান্য।
- ছোট ব্যবসায় বাইরের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।
- সভাপতি হ্যাসাপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন।
- হ্যাসাপ সেক্রেটারি-হ্যাসাপ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করবেন।
- হ্যাসাপ টিমের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ধরন চিহ্নিতকরণ ঃ
    - হ্যাসাপ মূলনীতিসমূহ,
    - পদ্ধতি বিশ্লেষণ,
    - হ্যাসাপ-এর সুফল/সুবিধা,
    - পণ্যের নিরাপত্তায় হ্যাসাপ-এর ভূমিকা, ইত্যাদি।

০৩। পণ্যের বর্ণনা

নিম্নোক্ত বিষয়ের আলোকে পণ্যের বর্ণনা প্রদান করতে হবে-

- পণ্যের উপাদানসমূহ,
- পণ্যের ধরন,
- ব্যবহৃত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি,
- প্যাকিং পদ্ধতি,
- সংরক্ষণ এবং বিতরণ,
- পণ্যের ব্যবহার উপযোগী সময়সীমা,
- ভোক্তা কর্তৃক ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা।

০৪। প্রত্যাশিত ব্যবহার চিহ্নিত করা

- পণ্যের প্রত্যাশিত বাজার,

- ভোক্তা শ্রেণী,
- অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়,
- পণ্যের অপব্যবহার।

০৫। প্রোসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম তৈরি করা

- ডায়াগ্রামটিতে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মাঝে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাত্রা এবং প্রবাহের (কালক্ষেপন সহ) প্রতিফলন ঘটতে হবে-
- সমস্ত কাঁচামাল, উপাদান এবং মোড়ক সামগ্রী,
- পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শ; যেমন-ক্লিনিং, রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি।
- নিম্নোক্ত বিষয়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে-
- কক্ষের মেঝের রেখাচিত্র, কক্ষের নকশা, উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা,
- কাঁচা মাল থেকে চূড়ান্তপণ্য পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সময়-তাপমাত্রার সম্ভাব্য অবস্থা,
- পুন:প্রক্রিয়াকরণ এবং পুন:ব্যবহার,
- কক্ষসমূহ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদির নকশা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট।
- নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা প্রযোজন-
- সংশ্লিষ্ট পরিবেশের স্বাস্থ্যগত অবস্থা,
- কর্মী চলাচলের পথ এবং কর্ম অভ্যাস,
- সম্ভাব্য আড়-সংক্রমনের উৎস,
- প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন এলাকায় উচ্চ ঝুঁকি/নিম্ন ঝুঁকি হিসেবে পৃথকীকরণ,
- সংরক্ষণ এবং বিতরণের অবস্থা,
- ভোক্তার ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা।

ফ্লো ডায়াগ্রামের উদাহরণ

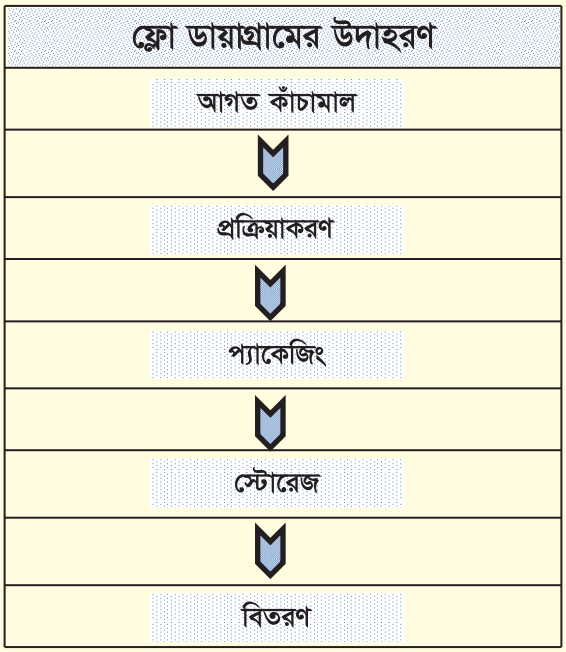

বি:দ্র: এটি একটি খুবই সাধারণ ফ্লো-ডায়াগ্রাম। প্রকৃত ফ্লো-ডায়াগ্রামে আরো অনেক খুটি নাটি বিষয়ের বর্ণনা থাকা প্রয়োজন।

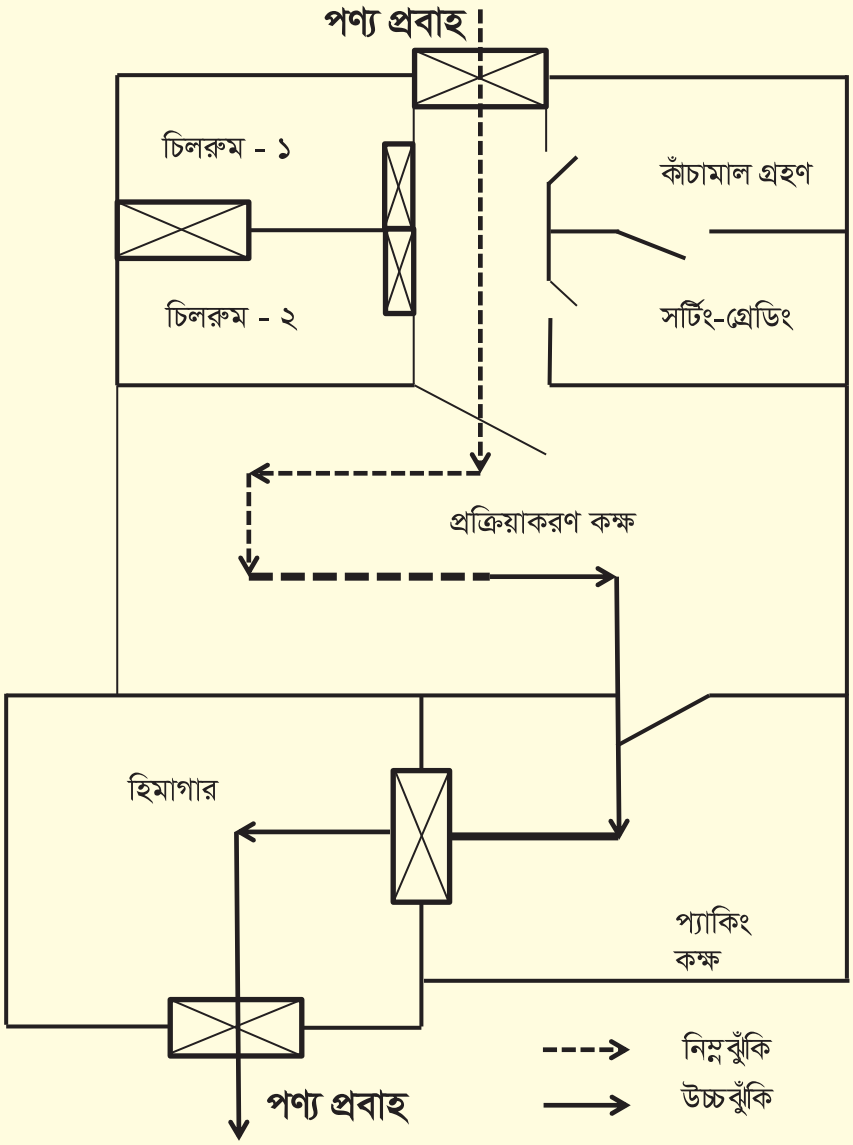

চিত্রঃ ফ্লো ডায়াগ্রাম সংশ্লিষ্ট ফ্লোর প্লানের উদাহরণ।

০৬। ফ্লো ডায়াগ্রামের যথার্থতা যাচাই করা

- নিম্নোক্ত বিষয়ের আলোকে ফ্লো ডায়াগ্রামটি যে যথার্থই প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকে প্রতিফলন করে তা নিশ্চিত করুনঃ
  - দিনের বিভিন্ন সময়ে, শিফ্‌টে, সপ্তাহে, মাসে এবং বৎসরে।
- চলমান প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরকে প্রশ্ন করে ডায়াগ্রামটির যথার্থতা যাচাই করতে হবে।
- কোন প্রক্রিয়াকরণ ধাপ যে বাদ যায়নি সেটা নিশ্চিত করতে হবে।
- সময়, তাপমাত্রা, কার্যপ্রণালী/প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য গুরুতপূর্ণ বিষয়ের সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যে নির্ভুল তা নিশ্চিত করতে হবে।

০৭। হ্যাজার্ড এনালাইসিস্ করা এবং প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ নির্ধারণ করা

- ফ্লো ডায়াগ্রামের সাহায্যে সকল গুরুত্বপূর্ণ হ্যাজার্ড চিহ্নিতকরণ-
    - o চলমান প্রক্রিয়াকরণ ঘুরে ঘুরে দেখার সময়.....
    - o হ্যাসাপ টিমের মিটিং-এ.....
- সকল প্রক্রিয়াকরণ ধাপ এবং ধাপ সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডসমূহকে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রক্রিয়াকরণ শুরুর পূর্বের হ্যাজার্ডের বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট খাদ্যের ধরন এবং অবস্থার বিষয়কেও বিবেচনা করতে হবে, যেমন- ওয়াটার এ্যাক্টিভিটি, অণুজীবগত অবস্থা এবং তার ক্ষতির সম্ভাবনা, পিএইচ, ইত্যাদি।
- প্রতিটি হ্যাজার্ডের দ্বারা বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনা ও তীব্রতার পূর্ব লক্ষণের বিষয়ে একমত হতে হবে।
- সম্ভাব্য বিবেচনার বিষয়-
    - o হ্যাজার্ডের দ্বারা ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা, যেমন- কারখানা কর্তৃপক্ষের ইতোপূর্বের অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ঘটনার উপাত্ত,
    - o হ্যাজার্ডের তীব্রতা, যেমন- মৃত্যুর আশংকা, সঙ্কটজনক, মৃদু,
    - o কতজন আক্রান্ত হতে পারে,
    - o সংবেদনশীলতা এবং সহজে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়সমূহ, যেমন- যুব, বৃদ্ধ, দুর্বল (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম),
    - o রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু টিকে থাকা বা বংশ বৃদ্ধি,
    - o খাদ্যে টক্সিন উৎপন্ন হওয়া বা পূর্বথেকেই বিদ্যমান থাকা,
    - o খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য বা ক্ষতিকর বস্তুর উপস্থিতি,
    - o উপরি-উক্ত বিষয়গুলোর কারণে সৃষ্ট পরবর্তী অবস্থাসমূহ,
- হ্যাসাপ টিম চিহ্নিত প্রতিটি হ্যাজার্ড থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।
- চিহ্নিত প্রতিটি প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই পণ্যের নির্দিষ্ট অবস্থার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যেমন- কোন কাঁচামালে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকতে পারে এবং তার বংশ বিস্তারও ঘটতে পারে
- কিন্তু ভালভাবে কুকিং করে তাকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পক্ষান্তরে কুকড্ চিল্ড পণ্যের বেলায় ঐ একই হ্যাজার্ডকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি পণ্যকে সবসময় নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- কোন একটি প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে যে একাধিক হ্যাজার্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, যেমনঃ- কুকিং-এর সাহায্যে একই সাথে স্যাল্‌মোনেলা ও ই.কলি কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহকে কারখানায় বিদ্যমান বা কারখানার জন্য প্রযোজ্য কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী বা কর্মপন্থার অংশ হিসেবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন হতে পারে, যেমন- ক্লিনিং সিডিউল, স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট কর্মপন্থা, ইত্যাদি।
- কার্যকর প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে সাথে সাথেই প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যাস অথবা সংশোধন করতে হবে।

০৮। ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (সিসিপি) নির্ধারণ করা

- সিসিপি নির্ধারণের জন্য একটি যুক্তিসংগত এবং সঙ্গতিপূর্ণ কর্মপ্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- সিসিপি নির্ধারণের বিষয়টিকে যুক্তিসংগত এবং নির্ভুল করার জন্য 'সিসিপি ডিসিশান ট্রি' ব্যবহার করা যেতে পারে।
- 'সিসিপি ডিসিশান ট্রি' কে সব ধরনের হ্যাজার্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- 'সিসিপি ডিসিশান ট্রি' ব্যবহারের জন্য হ্যাসাপ টিমকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিৎ।

সিসিপি ডিসিশন ট্রি

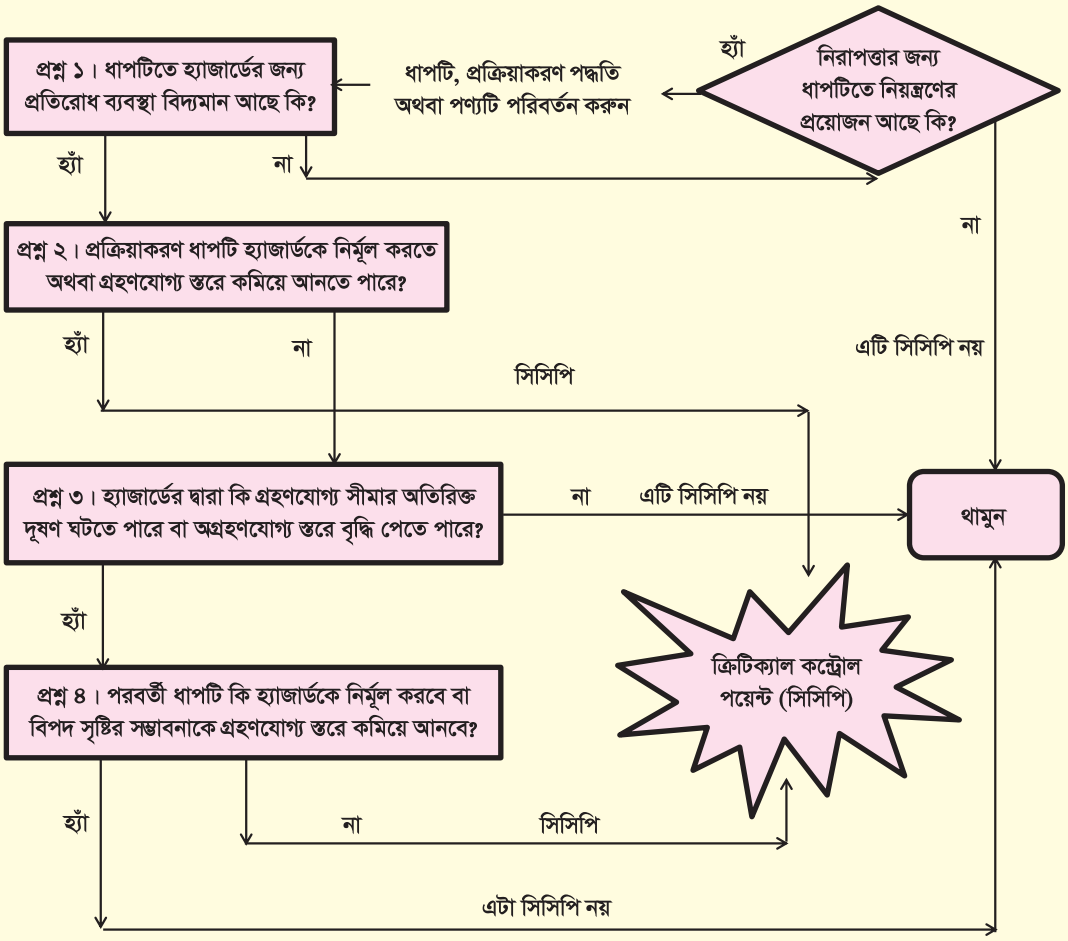

‘সিসিপি ডিসিশন ট্রি’ এর ব্যাখ্যা

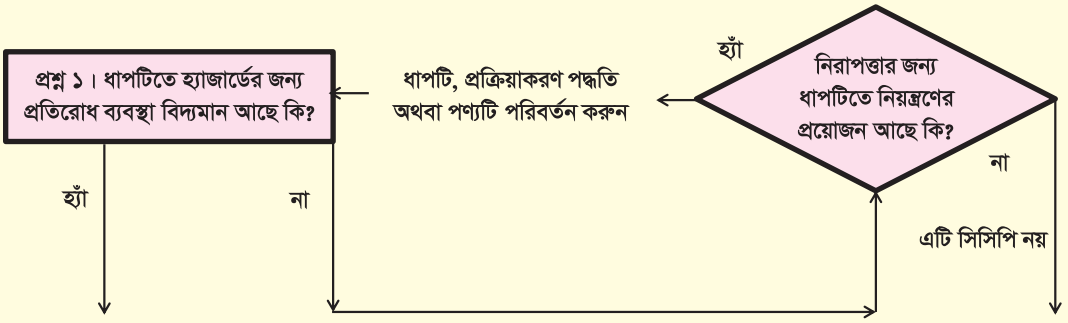

- প্রশ্ন ১ এর উত্তরে যদি আমরা 'হ্যাঁ' বলি তাহ'লে আমাদেরকে এরপর প্রশ্ন ২ এ যেতে হবে,
- প্রশ্ন ১ এর উত্তরে যদি আমরা 'না' বলি (অর্থাৎ ধাপটিকে হ্যাজার্ডের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই) তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, নিরাপত্তার জন্য ধাপটিতে নিয়ন্ত্রণের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনাঃ
  - নিরাপত্তার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন না হলে ধাপটি একটি সিসিপি নয়,
  - নিরাপত্তার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হলে ধাপটিতে বা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে বা পণ্যটিতে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যেন সেখানে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যায়,
- উল্লেখিত অবস্থায় হ্যাসাপ টিমের উচিৎ হবে ধাপটিতে বা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে বা পণ্যটিতে পরিবর্তনের সুপারিশ করা। টিম প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থারও সুপারিশ করবেন। অতপর টিম সুপারিশকৃত প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে কার্যকর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন অনুমোদনের জন্য কারখানার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে।

'সিসিপি ডিসিশন ট্রি' এর ব্যাখ্যা : (/চলমান)

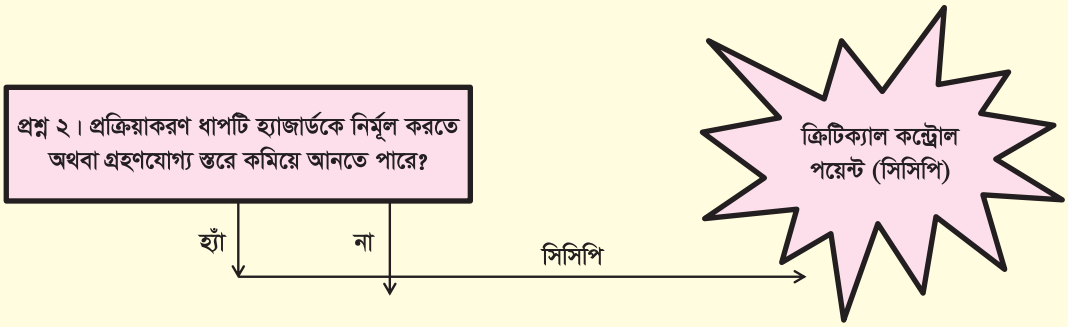

- প্রশ্ন ২ এর উত্তরে যদি আমরা 'হ্যাঁ' বলি তাহলে আমরা এমন একটি প্রক্রিয়াকরণ ধাপ পেলাম যেটি একটি 'সিসিপি'। এর কারণ এই যে, যে হ্যাজার্ডটির জন্য প্রশ্ন করা হচ্ছে, প্রক্রিয়াকরণ ধাপটি তার জন্যই প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে,
- সিসিপি ডিসিশানে উপনীত হওয়ার পর হ্যাসাপ টিম অবশ্যই সিদ্ধান্ত দিবেন যে, খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঠিক কোন্ বিষয়টিকে বা বিষয়গুলোকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যেমন- তাপমাত্রা, কোন কর্মঅভ্যাস বা কর্মপ্রণালী বা দূষণের একটি পর্যয়ে যেটি গ্রহণযোগ্য বা নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত হবে,
- সিসিপি-এর ক্রিটিক্যাল বিষয়/বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর হ্যাসাপ টিম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়াকরণ ধাপে চিহ্নিত অন্য হ্যাজার্ডের জন্য 'সিসিপি ডিসিশান ট্রি' প্রয়োগ করবেন,
- প্রশ্ন ২ এর উত্তরে যদি আমরা 'না' বলি তাহলে আমাদেরকে এর পর প্রশ্ন ৩ এ যেতে হবে।

'সিসিপি ডিসিশন ট্রি' এর ব্যাখ্যা : (/চলমান)

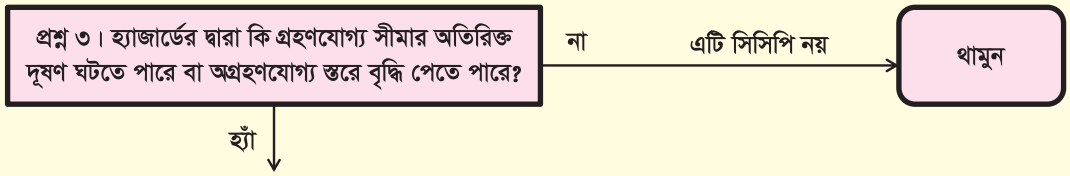

- প্রশ্ন ৩ এর ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফ্লো ডায়াগ্রামের পাশাপাশি হ্যাসাপ টিম অবশ্যই পণ্য ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের বাস্তব জ্ঞান/অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন, যেমন- অতীত ইতিহাস (সরবরাহকারী, প্রক্রিয়াকরণ), কেস্ স্ট্যাডি, প্রাসংগিক অন্যান্য উপাত্ত,
- প্রশ্ন ৩ এর উত্তরে যদি আমরা 'না' বলি তাহলে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ধাপটি সিসিপি নয়; কারণ এক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, হ্যাজার্ডের দ্বারা গ্রহণযোগ্য সীমার অতিরিক্ত দূষণ ঘটার বা অগ্রহণযোগ্য স্তরে বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা নেই,
- প্রশ্ন ৩ এর উত্তরে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকলে 'হ্যাঁ' বোধক উত্তরকে গ্রহণ করা উচিৎ হবে; কারণ প্রশ্ন ৪ অবশেষে এটি নির্ধারণ করবে যে, চিহ্নিত হ্যাজার্ডটির কারণে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ ধাপটি সিসিপিতে পরিণত হবে কি না,
- প্রশ্ন ৩ এর উত্তরে যদি আমরা 'হ্যাঁ' বলি তাহলে আমাদেরকে এরপর প্রশ্ন ৪ এ যেতে হবে।

'সিসিপি ডিসিশন ট্রি' এর ব্যাখ্যা : (/চলমান)

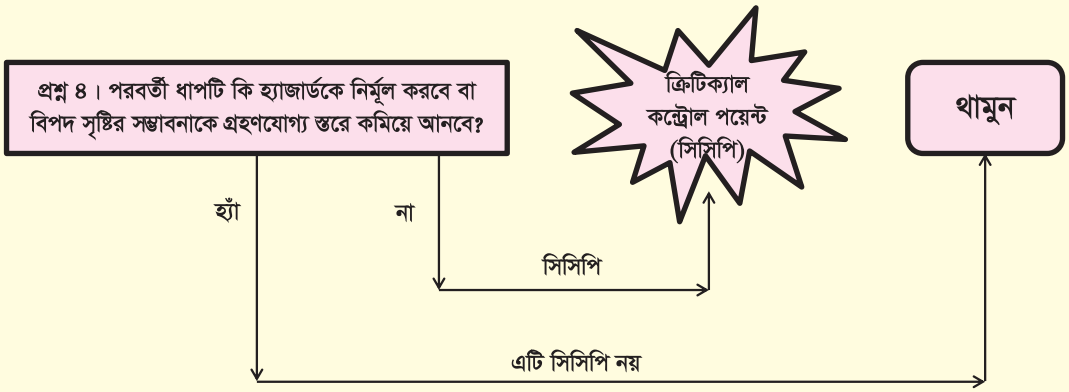

- প্রশ্ন ৪ এর উত্তরে যদি আমরা 'হ্যাঁ' বলি তাহলে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ ধাপটি সিসিপি হবেনা; অথাৎ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডটি পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ ধাপে নিয়ন্ত্রিত হবে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী যে ধাপে হ্যাজার্ডটি নিয়ন্ত্রিত হবে সিসিপি ডিসিশান ট্রি-এর প্রশ্ন ২ অনুসারে সেটি একটি সিসিপি হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয় এই যে, পরবর্তী ধাপে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডটি প্রকৃতপক্ষেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা,
- প্রশ্ন ৪ এর উত্তর 'না' হলে আমরা এটি নির্ধারণ করলাম যে, পরবর্তী কোন প্রক্রিয়াকরণ ধাপ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং কারণেই প্রক্রিয়াকরণ ধাপটি সিসিপি হবে,
- সিসিপি ডিসিশানে উপনীত হওয়ার পর হ্যাসাপ টিম অবশ্যই সিদ্ধান্ত দিবেন যে, খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঠিক কোন্ বিষয়টি বা কোন্ কোন্ বিষয়গুলিকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যেমন- তাপমাত্রা, কোন কর্মঅভ্যাস বা কর্মপ্রণালী বা দূষণের পর্যায়, যেটি গ্রহণযোগ্য বা নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত হবে,

০৯। ক্রিটিক্যাল লিমিট বা সঙ্কট সীমা প্রতিষ্ঠা করা

- সিসিপি চিহ্নিত হওয়ার পর ক্রিটিক্যাল লিমিট, লক্ষ্য মাত্রা এবং সহ্য সীমার বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে,
- কিছু কিছু ক্রিটিক্যাল লিমিট সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লেখিত আছে, যেমন- শৈত্য কক্ষ ও হিমাগারের তাপমাত্রা, হিমায়িত করণের তাপমাত্রা এবং সময়, ইত্যাদি
- অন্যান্য ক্রিটিক্যাল লিমিটগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিভিন্ন কেস স্টাডি বা গবেষণা কাজের পর্যালোচনা থেকে নির্ধারণ করার প্রয়োজন হতে পারে,

- সিসিপি-এর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা এবং সহ্য সীমাসমূহকে অবশ্যই পরিমাপযোগ্য এবং সিসিপি সংশ্লিষ্ট হতে হবে, যেমন- তাপমাত্রা, সময়, এসপিসি, এটিপি, মুক্ত ক্লোরিণ, ইত্যাদি।

১০। সিসিপিসমূহের মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা

- সঠিক মনিটরিং প্রণালী নির্বাচন অত্যাবশ্যক,
- মনিটরিং প্রণলী হওয়া উচিৎঃ
  - পরিকল্পিত,
  - লিখিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত,
  - যথোচিত বিরতিতে,
  - নিরীক্ষিত এবং যথার্থতা যাচাইকৃত,
- মনিটরিং কৌশল হতে পারেঃ
  - অন-লাইন, অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণের সময়, যেমন- তাপমাত্রা পরিমাপ, ধাতব পদার্থ শণাক্তকরণ। এ ধরনের কৌশলে মূলত: স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এ পদ্ধতিতে চলমান প্রক্রিয়াকরণের তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ অবস্থা অবলোকন করা যায়। এ ধরনের কৌশলে স্বয়ংক্রিয় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা থাকে যা যে কোন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অবস্থায় সতর্ক সংকেত প্রদান করে,
  - অফ-লাইন, অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণ সময়ের বাইরে, যেমন- লবণের পরিমান, মুক্ত ক্লোরিণের পরিমান, পিএইচ, ওয়াটার এ্যাক্টিভিটি, ইত্যাদি পরিমাপ করা। এ ধরনের কৌশল সময় স্বাপেক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোক ও যন্ত্রের প্রয়োজন হয়,
- মনিটরিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর বিষয়টিকে যথাসময়ে সণাক্ত করায় সক্ষম হতে হবে, যেন নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে দ্রুত সংশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এর ফলে ত্রুটিযুক্ত পণ্য উৎপাদনের ঝামেলায় পড়তে হয়না, অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত পণ্য পৃথকীকরণ বা রি-কল করার প্রয়োজন হয় না,
- জীবাণুতাত্বিক মনিটরিং পদ্ধতি বেশ সময় স্বাপেক্ষ এবং সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন ও প্রায় ক্ষেত্রেই পরবর্তী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এ কারণেই এটি কার্যকর মনিটরিং পদ্ধতি নয়,
- মনিটরিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ঃ
  - কি মনিটর করতে হবেঃ নিশ্চিত হন যেন এটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট সিসিপি-এর সংগে সরাসরি সম্পর্কিত হয়,
  - কোথায় মনিটরিং করতে হবেঃ অন-লাইন, অফ-লাইন, ইত্যাদি,
  - কিভাবে মনিটরিং পরিচালনা করতে হবে ঃ একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নির্দিষ্ট লোক এবং যন্ত্রের (ক্যালিব্রেশান সহ) প্রয়োজন হবে,
  - কে মনিটর করবেঃ পদবী চিহ্নিত করুন,
  - কৌশলঃ কার্যকর ফলাফলের জন্য অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে, যেমন- কেন্দ্রের তাপমাত্রা বনাম উপরিভাগের তাপমাত্রা,
  - সংঘটনের হারঃ মনিটরিং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রবণতা বা গতিধারা সণাক্ত করার জন্য যত বেশী ঘন ঘন সম্ভব মনিটরিং করা উচিৎ,
  - ফলাফল প্রাপ্তির গতিঃ যত দ্রুত পাওয়া যাবে ততই ভাল

১১। কারেকটিভ এ্যাকশান বা সংশোধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা

- নিম্নোক্ত বিষয় মোকাবেলার জন্য সংশোধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে-
  - নিয়ন্ত্রণ হারানোকে মোকাবেলার জন্য,
  - নিয়ন্ত্রণ হারানোর প্রবণতাকে মোকাবেলার জন্য,
- নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থাকে ন্যূনতম সীমার মধ্যে রাখার জন্য যতটা সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশোধন ব্যবস্থা নিতে

হবে। আকস্মিক সংকট মোকাবেলার একটি ভাল পরিকল্পনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী ভূমিকা রাখবে,

- সিসিপি-এর নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থায় প্রক্রিয়াজাত/উৎপাদিত ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের বেলায় কি সংশোধন ব্যবস্থা নেয়া হবে সে বিষয়ে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অর্থাৎ পণ্য সরিয়ে ফেলা বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা হবে কিনা এবং উল্লেখিত সংশোধন ব্যবস্থাটিই খাদ্য-নিরাপত্তা হ্যাজর্ডে পরিণত হয় কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে,

১২। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার যথার্থতা যাচাই করা

- লিখিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত একটি যথার্থতা যাচাইকরণ পদ্ধতি বা ভেরিফিকেশন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা উচিৎ যা মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে হ্যাসাপ পদ্ধতির উপর নির্ভরতার বিষয়টিকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে,
- ভেরিফিকেশান পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূর্ণ হ্যাসাপ পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত এবং রেকর্ডসমূহকে পরীক্ষা করা উচিৎ,
- নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ভেরিফিকেশান কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে-
    - অভ্যন্তরীণ/বাইরের নিরীক্ষা (অডিটিং),
    - সিসিপিগুলিতে বর্ধিতহারে মনিটরিং,
    - ক্রেতা সাধারণের মধ্যে সার্ভে এবং স্বাক্ষাৎকার,
- শর্ত পূরণে ব্যর্থতার জন্য গৃহীত কার্যব্যবস্থার লিখিত প্রমাণ।

১৩। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা

- হ্যাসাপ পদ্ধতির লিখিত প্রমাণ বা রেকর্ডসমূহকে তিন শ্রেনীতে ফেলা যায়-
    - হ্যাসাপ পদ্ধতি; হ্যাজার্ড এনালাইসিস্, সিসিপি নির্ধারণ , ইত্যাদি
    - বিভিন্ন কার্যপ্রণালী এবং কার্য-নির্দেশনা,
    - মনিটরিং ,সংশোধন ব্যবস্থা এবং ভেরিফিকেশন কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত রেকর্ডসমূহ,
- লিখিত প্রমাণাদি, কার্যপ্রণালী এবং রেকর্ডসমূহের সংরক্ষণ পদ্ধতি কারখানার আকার, প্রক্রিয়াকরণের ধরন এবং ঝুঁকির মাত্রার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিৎ। বিষয়গুলো কারখানা ভেদে ভিন্ন হতে পারে।
- রেকর্ডগুলোকে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা উচিৎ। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ বিধিতে এই সময় সীমা বেধে দেয়া আছে, যেমন- ই,ইউ-এর ক্ষেত্রে ২ বৎসর।

১৪। হ্যাসাপ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা

- নিম্নোক্ত বিষয়ের ভিত্তিতে হ্যাসাপ পদ্ধতি পর্যালোচনার বিষয়টি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ-
    - প্রক্রিয়াজাত পণ্যের সংগে সম্পৃক্ত ঝুঁকির মাত্রার ভিত্তিতে যখনই পণ্যের কোন অংশে (যেমন-কাঁচামাল), প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়াকরণ কৌশল) অথবা সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, যখনই পণ্য এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত এমন কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় যা হ্যাসাপ প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে, যেমন- নতুন প্যাথোজেনের উদ্ভব, খাদ্য-বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে,
    - ক্রেতার পছন্দে এবং চাহিদায় পরিবর্তন ঘটলে,
    - উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিতে বা যন্ত্রপাতির ডিজাইনে কোন পরিবর্তন ঘটলে,
- পর্যালোচনায় প্রাপ্ত রেকর্ডসমূহ হ্যাসাপ পদ্ধতির রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষিত হবে।

বিঃদ্রঃ

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে হ্যাসাপ-এর মূল বিষয় এবং এর বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি আলোচনা করা হল। প্রতিটি ধাপের খুটি-নাটি বিষয় আলোচনা করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, হ্যাসাপ এমন একটি পদ্ধতি যাকে খুব সহজেই যে কোন কর্মপ্রক্রিয়ায় এমনকি স্ব-গৃহেও প্রয়োগ করা যায়। হ্যাসাপের এই গতিশীল প্রকৃতির কারণে এটি সমগ্র বিশ্বে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাপনার আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

পাঠ - ১২
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত নীতিমালা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে গবাদিপশু, হাঁসমুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৬৬% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩২%। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.৩১% (প্রাক্কলিত)। তাছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির ভলিয়ম ছিল ৩৫,৫৭৬ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত) যা বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২,৬৬৬ কোটি টাকা বেশী (বিবিএস, ২০১৬-১৭)। এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দেশের জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষমাত্রা যথাক্রমে ২৫০ মিলি/দিন, ১২০ গ্রাম/দিন ও ১০৪টি/বছর পুরণের জন্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন: গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন; দুগ্ধ ও মাংসল জাতের গরু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্রাহমা জাতের সংযোজন এবং কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন; পশু খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন ও পশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন। অধিকন্ত প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্খিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ সরকার রুপকল্প-২০২১ (Vision-2021), টেকসই উন্নয়ন অভীক্ষ (Sustainable Development Goals, SDG-2030) এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা জোরদারকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের বাজেট (রাজস্ব এবং উন্নয়ন) সংশ্লিষ্ট ফলাফলধর্মী (result oriented) বাৎসরিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়নের জন্যে সম্পাদিত চুক্তিই হলো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বা APA। দেশে সর্বপ্রথম ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪৮ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। পরবর্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি মহাপরিচালক ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সংঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় ২৪ টি প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে মহাপরিচালক (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) পরিচালক বৃন্দের সংঙ্গে এবং পরিচালক বৃন্দ উপপরিচালক/অধস্তন দপ্তর সমূহের সংঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পরবর্তিতে উপ-পরিচালকবৃন্দ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণের সাথে এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ তাঁর অর্ধস্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণের সংঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একইভাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অধিদপ্তরের ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় ২৫ টি প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে এবং কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক নির্ধারিত ৫টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় ১৭ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাসহ মাঠ পর্যায়ে চুক্তি স্বাক্ষারিত হয়েছে। এছাড়া চুক্তিসমূহ যথাসময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। এ চুক্তি সম্পাদন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমকে পদ্ধতিনির্ভর থেকে ফলাফলনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মসম্পাদন নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে দেখা গিয়েছে যে, APA বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহজতর হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের APA বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়ছে যা দেশের সার্বিক প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে এবং ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত নীতিমালা

১. প্রেক্ষাপট

তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম জোরদার করণের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মত চলমান ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই নীতিমালা অনুসরণ করে বিভাগীয়/আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

২. বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো

বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র, উপক্রমনিকা এবং নিম্নবর্ণিত সেকশন ও সংযোজনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

সেকশন ১: রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objectives) এবং কার্যাবলি (functions)।

সেকশন ২: কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা।

সংযোজনী-১: শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)।

সংযোজনী-২: কার্যক্রম, কর্মসম্পদান সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ইউনিট/শাখা এবং পরিমাপ পদ্ধতি।

সংযোজনী-৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যালয়সমূহের উপর নির্ভরশীলতা।

বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমুহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির একটি কাঠামো পরিশিষ্ট-ক এ সংযোজিত হল। উক্ত কাঠামো অনুসরণ করে প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করবে।

২.১ কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র:

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ মূলত সরাসরি নাগরিকদের সেবা প্রদান করে থাকে বিধায় তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কার্যক্রমের সার্বিক তথ্যাদিসহ সংক্ষেপে কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের একটি চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। এ অংশে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের গত ৩ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলি এবং ভবিষ্যতে এ কার্যালয় কী কী প্রধান প্রধান লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তার পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে হবে। তাছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্রে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে।

২.২ উপক্রমণিকা:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শুরুতে একটি উপক্রমণিকা থাকবে যাতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জনের বিষয়ে তাদের সম্মত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে।

২.৩ সেকশন-১: রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objectives) এবং কার্যাবলি (functions):

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ মূলত সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে বিধায় সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হবে। রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objectives) এবং কার্যাবলি (functions) লেখার সময় নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিবেচনায় রাখতে হবে:

ক) রূপকল্প (vision): রূপকল্প মূলত একটি দপ্তর/সংস্থার ভবিষ্যত আদর্শ অবস্থা (idealized state) নির্দেশ করে। একটি দপ্তর/সংস্থাকে তার নেতৃত্ব ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় দেখতে চায়, রূপকল্পে তার একটি বৃহত্তর চিত্র পাওয়া যাবে। রূপকল্প

সাধারণত ৫-১০ বছর মেয়াদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ফলে কোন দপ্তর/সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন না হলে বা কাজের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন না হলে রূপকল্প বছর বছর পরিবর্তিত হবে না। একটি ভাল রূপকল্প সহজে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য হবে। এটি জনগণের কল্পনায় ধারণ করার মত সংক্ষিপ্ত ও জোরালো হবে যা গন্তব্য নির্দেশ করবে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ নকশা নয়। রূপকল্প জনগণকে উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীবিত করবে, যা হবে একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং চ্যালেঞ্জিং।

খ) অভিলক্ষ্য (mission): একটি দপ্তর/সংস্থার অভিলক্ষ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয় এবং অভিলক্ষ্য হবে কীভাবে রূপকল্প অর্জন করা যায় তার নির্দেশনা। তাই সুস্পষ্টভাবে অভিলক্ষ্য ব্যক্ত করার লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে:

- দপ্তর/সংস্থার মৌল উদ্দেশ্য কী অর্থাৎ কী অর্জন করতে চায়;
- কীভাবে অর্জন করতে চায়; এবং
- কার জন্য অর্জন করতে চায়, অর্থাৎ এর সম্ভাব্য উপকারভোগী কারা।

মোটকথা একটি অভিলক্ষ্য অবশ্যই রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। রূপকল্প মূলত বৃহত্তর কল্পনা এবং অভিলক্ষ্য রূপকল্প অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নির্দেশ করে।

গ) কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objectives): কৌশলগত উদ্দেশ্য বলতে নির্দিষ্ট সময়ে-স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে-মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার অধিক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সেগুলিকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য হতে পারে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ। সরকারের রূপকল্প-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), অন্যান্য কৌশলগত দলিল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নীতি সংক্রান্ত দলিলসমূহ এবং বাজেট কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে। দপ্তর/সংস্থার পক্ষে অর্জন করা কষ্টসাধ্য কেবল এরূপ বিবেচনায় বা সহজে অর্জনযোগ্য বিবেচনায় কোন কৌশলগত উদ্দেশ্য বিয়োজন বা সংযোজন করা সমীচীন হবে না। অবশ্যই দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কার্যাবলিসমূহ এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি সংযোগ থাকতে হবে।

ঘ) কার্যাবলি (functions): মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক তাদেরকে যে সকল কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলির তালিকা প্রস্তুত করবে। কার্যাবলির তালিকা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.৪ সেকশন-২: কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা:

কলাম ১: কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের তালিকা ও মান

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য সেকশন ১-এ বর্ণিত কৌশলগত উদ্দেশ্য ছাড়াও কতিপয় আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন সর্বমোট ১০০ মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে। এই ১০০ মানের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে স্ব-স্ব কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ৮০ নম্বর এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ২০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

কলাম ২: কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আপেক্ষিক মান বরাদ্দকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান বেশি হবে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান কম হবে।

কলাম ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম সুনির্দিষ্টকরণ

প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে উক্ত উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। কখনো

কখনো একটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে এক বা একাধিক কার্যক্রম থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক তথা ফলাফলধর্মী কর্মসংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান করে এরূপ কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন বাজেটের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং প্রকল্পের গুণগতমান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কলাম ৪: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ এবং তার একককসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ

কলাম ৩-এ বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহকে এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করতে হবে যা দ্বারা বছর শেষে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করা হবে। কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কোন রকম দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।

কলাম ৫: কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রার একক

কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের একক এই কলামে উল্লেখ করতে হবে। সূচকসমূহ পরিমাপের লক্ষ্যে যথাযথ একক ব্যবহার করতে হবে। যেমন: মাত্রা, সংখ্যা (হাজার, লক্ষ, কোটি), তারিখ, %, জনঘন্টা ইত্যাদি।

কলাম ৬: কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে মান (weight) বন্টন

কোন কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে একাধিক কার্যক্রম থাকলে প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক থাকবে এবং প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে একটি নির্ধারিত মান (weight) থাকবে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকের মান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সবগুলি সূচকের মোট মান সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত মানের সমান হয়।

কলাম ৭ ও ৮: এই কলামদ্বয়ে যথাক্রমে বিগত ২টি অর্থবছরের (২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭) প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করতে হবে।

কলাম ৯-১৩: এ কলামগুলোতে কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ থাকবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কর্মসম্পাদন উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সুতরাং লক্ষ্যমাত্রা একই সঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং উচ্চাকাংখী হওয়া উচিত। লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে নিম্নরূপ ৫ দফা স্কেলে বিন্যস্ত করতে হবে:

অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অর্জনকে চলতিমান বিবেচনা করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চলতিমান এর কলামে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত অর্জনের চেয়ে কম কোন অর্জন চলতিমানের নিম্নের কলামে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য, কোন কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ৬০% এর নিচে হলে প্রাপ্ত মান ধরা হবে ০ (শূন্য)।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং মধ্য-মেয়াদী বাজেট কাঠামোয় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রায় বিধৃত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত অর্জন ও অর্জনের প্রবৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সক্ষমতা, উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিরাজমান বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে।

কলাম ১৪-১৫: ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা কলাম ১৪ ও ১৫-এ উল্লেখ করতে হবে।

২.৫ সংযোজনী-১: শব্দসংক্ষেপ (acronyms)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরুপ সংযোজনী ১-এ সন্নিবেশ করতে হবে যাতে চুক্তিটিতে উল্লিখিত শব্দসংক্ষেপের বর্ননা সবাই সহজেই বুঝতে পারে।

২.৬ সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকরী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন ২-এ উল্লিখিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ও উপাত্তসূত্র সংযোজনী ২-এ উল্লেখ করতে হবে। এ সংযোজনীতে প্রতিটি কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে হবে যাতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ চুক্তিটিতে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলি সহজেই বুঝতে পারে।

২.৭ সংযোজনী-৩: মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

মাঠ পর্যায়ের কোন কোন কার্যালয়ের কতিপয় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের সফলতার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্য কার্যালয়ের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি সংযোজনী ৩-এ উল্লেখ করতে হবে। এই নির্ভরশীলতার মাত্রা সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হতে হবে। যেহেতু এই নির্ভরশীলতা মাঠ পর্যায়ের অন্য কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে সেহেতু নির্ভরশীলতার মাত্রা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উদাহরনস্বরুপ বলা যায়, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ/র‍্যাব বা অন্য কোন সংস্থার উপর ২০% এর অধিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে সংযোজনী ৩-এ বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে।

৩. মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পুরস্কার প্রদান

অর্থবছর শেষে সকল কার্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রমের বিপরীতে স্ব স্ব কার্যালয় বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করবে। নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক তা যাচাই করা হবে। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে মোট ১০০ নম্বরের স্কোরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে এবং সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে সিভিল সার্ভিস এওয়ার্ড, সিভিল সার্ভিস ক্রেষ্ট, প্রনোদনা প্রদান এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া (২০১৭-১৮)

৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও অনুমোদন

- মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (ঝউএ)-২০৩০, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা/দলিল এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করতে হবে।
- কৌশলগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ মূলত সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরের বাজেট বরাদ্দের আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের বিপরীতে কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা টিম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম খসড়া প্রস্তুত করবে। প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া কার্যালয় প্রধান অনুমোদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টিম কর্তৃক পর্যালোচনা করতে হবে। জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পর্যালোচনা করতে হবে। বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া পরিচালক (সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ স্ব স্ব জেলা কার্যালয় পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করবে।
- সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টিমের সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি চূড়ান্ত করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করবে।
- সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন

চুক্তিসমুহ অনুমোদন করবে। জেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ স্ব স্ব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করবে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

- অনুমোদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত সময়-সীমার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করতে হবে।
- স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে (bangladesh.gov.bd) প্রকাশ করতে হবে।

৪.২ কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ

সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.৩ কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন

অর্থবছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ছয় মাসে অর্জিত ফলাফলসহ একটি অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বৎসরান্তে মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল উল্লেখপূর্বক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

৪.৪ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল করবে।

৪.৫ কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম তদারকিকরণ:

স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের এপিএ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ অধ:স্তন কার্যালয়সমূহের এপিএ কার্যক্রমগুলো তদারকি করবে। তাছাড়া সময় সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম তদারকি করবে। তাই এ তদারকির সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে:

- প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য পৃথক পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে;
- প্রতিটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে খামারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে;
- প্রতিটি কার্যক্রমের প্রমানক সংরক্ষণ করতে হবে;
- রেজিষ্টারে প্রতিটি তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে;
- প্রতিটি দপ্তরে একইরকম ছকে প্রতিটি কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;
- অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিদর্শন কালে এপিএ হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন এবং প্রয়োজনে সরেজমিনে কার্যক্রমসমূহ প্রদর্শন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক/----------

এবং

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা
সেকশন ১: রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি
সেকশন ২: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (acronyms)
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি এর বিবরণ
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

----------এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of ----------)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ
* সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ
* সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ
* ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

উপক্রমণিকা (preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিচালক, ---------- এবং
মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর মধ্যে ২০১৭ সালের ---------- মাসের ----------তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১:
রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি
১.১ রূপকল্প (vision): সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।
১.২ অভিলক্ষ্য (mission): প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপুরণ।
১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (strategic objectives):
১.৩.১ দপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৪. প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. কার্যাপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১.৪ কার্যাবলি (functions):
১.৪.১ দুধ, মাংস,ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
১.৪.২ গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
১.৪.৩ গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
১.৪.৪ গবাদিপশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
১.৪.৫ গবাদিপশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
১.৪.৬ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
১.৪.৭ গবাদিপশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
১.৪.৮ গবাদিপশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
১.৪.৯ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
১.৪.১০ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন;
১.৪.১১ প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষমাত্রাসমূহ

(মোট মান-৮০)

কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (weight of strategic objective)	কার্যক্রম (activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (performance indicators)	একক (unit)	কর্মসম্পদন সূচকের মান (weight of performance indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক: ২০১৭-১৮ (target/criteria value of FY 2017-18)					প্রক্ষেপন (projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপন (projection) ২০১৯-২০
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
(মোট মান-২০)

কলাম ১	কলাম ২	কলাম ৩	কলাম ৪		কলাম ৫	কলাম ৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যে সভন (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকেরমান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৭-১৮				
						অসাধারণ (Excel lent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৭ এপ্রিল	১৯ এপ্রিল	২০ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তির অর্থ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৭ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি
		২০৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ						
কার্যপদ্ধতি কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহে কমপক্ষে একটি অনলাইনে সেবা চালুকরা	অনলাইন সেবা চালুকৃত							
		দপ্তর বা সংস্থার কমপক্ষে একটি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত							
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ওSmall Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত							
			এসআইটি বাস্তবায়িত							
		পিআরএল শুরুর ২৩ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটির নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরীপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটির নগদায়ন পত্র যুগপৎ জারিকৃত							
		সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত							
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ							
		সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (Waiting Room) এর ব্যবস্থা করা	নির্ধারিতসময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত							
		সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত							

** ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্যূন ২০ ঘন্টা সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত নীতিমালা

আমি, পরিচালক-----------------, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালক, -------------------------- এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

পরিচালক, ------------------------
----------------------------- তারিখ
----------------------------।

....
মহাপরিচালক তারিখ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত ছকটি অনুসরন করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ	বর্ণনা
১.	এআই	কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination)
২.	বিএলআরআই	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Livestock Research Institute)
৩.	বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)
৪.	ডিএলএস	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (Department of Livestock Services)

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য

সংযোজনী-৩

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব

বাংলা নিবন্ধ ও বইসমূহ:

ফৌজদার এসকে ২০১০, খাদ্যমান এবং উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গো-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ, মাসিক খামার, অক্টোবর ২০১০ সংখ্যা।

আব্দুল হক এম, জিনাত আলী শে এবং আমিনুর রহমান আনম ২০১১, গবাদিপশু পালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আইনুল হক এম, আজিজুল হক ঢালী এম, রুহুল আমীন এম রফিকুল ইসলাম এম এবং আমজাদ হোসেন ভূঞা এম ২০১০, বীফ ব্রিড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

আমিনুর রহমান আনম এবং মোস্তাফিজুর রহমান এম ২০১১, পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ইমদাদুল হক কাএম ২০০৩, ট্রেনিং ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

ফাত্তাহ কাআ ২০০০, বকনা খামার স্থাপন হ্যান্ড বুক, জাতীয় প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

মকবুলার রহমান এম ২০০১, বাণিজ্যিক মুরগি উৎপাদন প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, পোল্ট্রি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

রহমান আ ও চৌধুরী এক ২০০০, পশুখাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, অংশীদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

রশিদ এম ২০০৩, মৌলিক পুষ্টি পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শাহ্জাহান এম ২০০৮, পশুপাখির রোগ প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, পশুপাখির টিকা, ঔষধ, প্রজনন সামগ্রী ও পশুখাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

সালেউদ্দিন খান এম ২০০৭, কমিউনিটি এক্সটেনশন ওয়ার্কার (সিইডব্লিউ) প্রশিক্ষণ সহায়িকা, দ্বিতীয় অংশিদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, রংপুর

সামাদ এম, আমজাদ হোসেন ভূঞা এম এবং বজলুর রহমান এম ২০১৪, বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

সামাদ এমএ ২০০২, লাভজনক পশুপাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা, লেপ প্রকাশনা, ময়মনসিংহ।

জব্বার এমএ ১৯৯০, বাংলাদেশে পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতি ও কৌশল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

জাহাঙ্গীর আলম এবং মফিজুল ইসলাম এম ২০০৮, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

বিএলআরআই ২০০৮, পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

ডিএলএস ২০০৭, লাগসই প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পশুপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।

তালুকদার সাইফুল ইসলাম এবং মকবুলার রহমান ২০০০, কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

Full References

English Articles and Books:

Alam MGS, Rahman MA, Khatun M and Ahmed JU 2009: Feed supplementation and weight change, milk yield and post-partum oestrus in Desi cows. Bangladesh Veterinarian 26, 39-47.

Chowdhury R, Haque MN, Islam KMS and Khaleduzzaman ABM 2009: A review on antibiotics in an animal feed. Bangladesh Journal of Animal Sciences 38, 22-32.

Hossain MJ and Hassan MF 2013: Forecasting of milk, meat and egg production in Bangladesh. Research Journal of Animal, Veterinary and Fishery Sciences 1, 7-13.

Huque KS and Sarker NR 2014: Feeds and feeding of livestock in Bangladesh: performance, constraints and options forward. Bangladesh Journal of Animal Science 43, 1-10.

Islam MA 2014: Zoonoses in Bangladesh: the role of veterinarian in public health. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 12, 93-98.

Islam MH, Hashem MA, Hossain MM, Islam MS, Rana MS and Habibullah M 2012: Present status on the use of anabolic steroids and feed additives in small scale cattle fattening in Bangladesh. Progressive Agriculture 23, 1-13.

Islam MM, Siddiqui MAR, Haque MA, Baki MA, Majumder S, Parrish JJ and Shamsuddin M 2007: Screening some major communicable diseases of AI bulls in Bangladesh. Livestock Research for Rural Development 19, 6.

Khan MJ, Peters KJ and Uddin MM 2009: Feeding strategy for improving dairy cattle productivity in smallholder farm in Bangladesh. Bangladesh Journal of Animal Science 38, 67-85.

Lederman E, Khan SU, Luby S, Zhao H, Braden Z, Gao J, Karem K, Damon I, Reynolds M and Li Y 2014: Zoonotic parapoxviruses detected in symptomatic cattle in Bangladesh. BMC Research Notes 7, 816.

Mazed MA, Islam MS, Rahman MM, Islam MA and Kadir MA 2004: Effect of Urea Molasses Multinutrient Block on the reproductive performance of indigenous cows under the village condition of Bangladesh. Pakistan Journal of Biological Sciences 7, 1257-1261.

Rabbani MS, Alam MM, Ali MY, Rahman SMR and Saha BK 2004: Participation of rural people in dairy enterprise in a selected area of Bangladesh. Pakistan Journal of Nutrition 3, 29-34.

Rahman MM, Mahmud MAA, Baset MA, Mahfuz SU, Mehraj H and Uddin AFMJ 2014: Milk nutritional composition in relation to cow genotype and location of Bangladesh. International Journal of Business, Social and Scientific Research 1, 155-160.

Roess AA, Winch PJ, Ali NA, Akhter A, Afroz D, Arifeen SE and Darmstadt GL 2013: Animal husbandry practices in rural Bangladesh: potential risk factors for antimicrobial drug resistance and emerging diseases. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 89, 965-970.

Samad MA 2011: Public health threat caused by zoonotic diseases in Bangladesh. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 9, 95-120.

Sugulle AH, Bhuiyan MMU and Shamsuddin M 2006: Breeding soundness of bulls and the quality of their frozen semen used in cattle artificial insemination in Bangladesh. Livestock Research and Rural Development 18, 4.

Uddin MM, Sultana MN, Huylenbroek GV and Peters KJ 2014: Artificial insemination services under different institutional framework in Bangladesh. Bangladesh Journal of Animal Science 43, 166-174.

Notes

ঢাকার সাভারে নির্মাণাধীন 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার'